শরৎ-সাহিত্যে নারী

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

মূল্য দুই টাকা মাত্র

পি ৫৮, মনোহর পুকুর রোড,
কালিঘাট, কলিকাতা হইতে
শ্রীউমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

১। 'দত্তা'-পরিচয়..................॥৹

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। শিল্পী ও শিল্প.........(যন্ত্রস্থ)

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়,
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

যে-নারী

নারায়ণীর ন্যায় স্নেহময়ী,

পার্ব্বতীর ন্যায় সেবাপরা ও ত্যাগশীলা,

অন্নদার ন্যায় পতিব্রতা ও ধৈর্য্যশালিনী,

বিশ্বেশ্বরীর ন্যায় তেজস্বিনী ও বাৎসল্যপরায়ণা,

সেই নারীর উদ্দেশে

উৎসর্গ করিলাম

নিবেদন

'শরৎ-সাহিত্যে নারী'—পুস্তকের এই নামকরণ হইতে কেহ যেন না মনে করেন, যে, এই পুস্তকে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী-চরিত্রের আলোচনা ব্যতীত পুরুষ-চরিত্রের আদৌ আলোচনা নাই। নিতান্ত আবশ্যক-বোধে কয়েকটি পুরুষ-চরিত্রের আংশিক আলোচনাও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে। সহ-শিক্ষার কথা আলোচনা করিতে গেলে যেমন শিক্ষা বলিতে কি বুঝায় তাহার আলোচনা আবশ্যক, তেমনি শুধু শরৎচন্দ্রের কেন, যে-কোন সাহিত্য-স্রষ্টার সৃষ্ট নারী-চরিত্র আলোচনা করিতে গেলে নারীর সাধারণ স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। এইজন্য পুস্তকের প্রারম্ভে নারী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গিয়া 'নারী'-শীর্ষক নিবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। আর রসগ্রহণ ও সৌন্দর্য্যোপলব্ধির দিক্ দিয়া যাথার্থ্য রক্ষিত হয় ও সুসঙ্গত হয়—এই মনে করিয়া নারী-চরিত্র আলোচনার পরে 'কবি শরৎচন্দ্র'-শীর্ষক প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

আমার পরম-শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় অতিশয় স্নেহ-সহকারে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট যে আমি অধিকতর ঋণী হইলাম তাহা এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। দর্শন-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে সুষ্ঠুজ্ঞানবিশিষ্ট, দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দেহ ও মনের সাম্য-সংস্থাপনে ও উভয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী, আমাদের দেশের এমন অল্প কয়েক জনের অন্যতম ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল, এম-বি মহাশয়ের

সহিত আলাপ-আলোচনায় এই পুস্তক রচনায় আমার যে সুবিধা হইয়াছে সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। সাহিত্যামোদী শ্রীযুক্ত-উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন। তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। প্রুফ কপি সংশোধনের নানা অসুবিধার জন্য পুস্তকের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হইতে পারে। সুধী পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

ফাল্গুন, ১৩৪৩
কলিকাতা

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

সূচীপত্র

শরৎ-সাহিত্যে নারী

নারী

পুরুষ ও নারী একক নহে, আবার একেবারে বিভিন্নও নহে ; একই সত্তার বিভিন্ন অংশ মাত্র। ইহাদের মধ্যে পরস্পরের যে টান তাহাই ভৌতিক জগতে আকর্ষণ। নারীর সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ একটা মাদকতা বিশেষ। অবশ্য ইহাও সত্য যে, মাদক দ্রব্যই মাদকতার সব কথা নয়। সুরাপানে পা টলে, কিন্তু তার আগে মনের একাগ্রতার অভাবেই বুদ্ধির গোলমাল হয়, আবার বুদ্ধির প্রাখর্য্য থাকিলে মাদক দ্রব্যই তাহার অনন্যমনতা বা তন্ময়তার কারণ হইয়া উঠে।

সমুদ্র মহান্। ইহা একদিকে যেমন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তা-আদি বহুমূল্য দ্রব্যের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, অন্যদিকে তেমনি ইহা ঝড়-তুফান প্রভৃতি গর্ভে ধারণ করায় ভীতি-আশঙ্কার কারণ ও ভয়াবহ জন্তুর আশ্রয়-স্থলও বটে। ইহা মানব-মনকে যুগপৎ আশা, আনন্দ, শঙ্কা ও বিস্ময়ে নাড়া দেয়, নাচাইয়া তুলে এবং অভিভূত করে। নারীও মহতী। বুদ্ধির আবিলতা না রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, নারীই প্রকৃতির প্রতিকৃতি, অবয়ব, প্রকাশ ও বিস্ময়। তাহার ভালবাসার রাজ্য প্রকৃতির বায়ুরাজ্যের চেয়েও দুর্জ্ঞেয় ও দুরধিগম্য। Barometer ও Seismograph যন্ত্রের আবিষ্কারে প্রকৃতির খেয়ালের অর্থাৎ ঝড়-ঝাপ্টা, ভূমিকম্প ইত্যাদির পরিচয় মানুষের কাছে কিছু কিছু সহজ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মনঃ বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক না কেন, কেহ কি হলফ্ করিয়া বলিতে পারিয়াছে—

মেয়েদের ভালবাসার বায়ুমণ্ডলে কখন্ গুমট্ আসে, কখন্ সাইক্লোনিক মেজাজ আবির্ভূত হয় এবং কখন্ বা তাহার য়্যান্টি-সাইক্লোনিক আপ্যায়ন তাহার সমস্ত রূপ রসকে রূপায়িত করিয়া তুলে এবং চারিপাশকে আচ্ছন্নও করে। মনীষী লোকের মতে—প্রকৃতির অনুকরণই নাকি প্রকৃত উপভোগ, আর এই উপভোগের নিমিত্ত সাহিত্যের দরবারে যাহা পরিবেশন করা হয় তাহাই নাকি আর্ট বা কলা। রসসৃষ্টিই উহার লক্ষ্য। নারী এই রসভাণ্ডারের প্রধান উপকরণ। সেই জন্যই নারী নাকি এতই স্ফুট ও এতই সুন্দর।

এ জগতে পুরুষের সৌন্দর্য্য শৌর্য্যে-বীর্য্যে, কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী অপ্রকাশে, যাহা রূপ লইতে চায় এবং রসাক্রান্ত হইতে চায় মূলে তাহারই উৎস হইয়া অপ্রকাশ থাকার মধ্যে। নারীর প্রকাশ মধুরতায়, কামনায়; পুরুষের অপ্রকাশ অনুভূতিতে, চৈতন্যে; নারী এই পুরুষের কল্পনা জাগায়, কাজ বাড়ায়, ক্ষমতা যোগায়। নারী ও পুরুষ মিলিয়াই জীবজগৎ। নারী সসীম, পুরুষ অসীম। নারী এই অসীমতার স্বাধীনতা ভাঙ্গিয়া পুরুষকে প্রকাশের ঘেরা কোঠার মায়ারাজ্যে হাতছানি দিয়া টানিয়া আনে। পুরুষের আনন্দ অস্ফুট থাকিয়া, নারীর সৌন্দর্য্য প্রকাশমানা হইয়া। এই সৌন্দর্য্য-সায়রে অবগাহনই শিল্পীর লক্ষ্য। কিন্তু পুরুষ ডুব দেয় অতল জলে, শিল্পী তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। অসীমের বুকের যে তরঙ্গ তাহাই নারীর নিজস্ব এবং তাহাই নারীর পরিচয় পত্র। সেই জন্য শিল্পীর চিত্রনে নারী এতই সুন্দর।

পুরুষের আকৃতি, গঠন ও স্বভাব সবল, বলিষ্ঠ ও দৃঢ়, আর নারীর আকার ও প্রকৃতি দুর্ব্বল ও কোমল। ইহার জন্য পরস্পরের কেহ দায়ী নহে। স্বভাবের বশে নারীর গঠন দুর্ব্বল, আর স্বভাবের বশে তাহাকে সন্তানের জননী হইতে হয়। আপনার ও স্বীয় সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের

জন্যই পুরুষের শক্তির আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই জন্য নারীকে পুরুষের অধীন হইয়া থাকিতে হয় এবং ইহাতে দোষেরই বা কি থাকিতে পারে? প্রগতির জন্য পুরুষ ও নারী উভয়েরই প্রয়োজন। তা' ছাড়া প্রকাশের দিক্ দিয়া নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ মাতৃত্বে। এই কারণেই নারী ব্যতীত গৃহী নিরর্থক।[১] নারীর জন্যই সমাজ সমৃদ্ধ। পুরুষ আদি, কিন্তু নারী সৃষ্টির সহায়ক, শুধু অনুপূরক নয়, পরিপূরক।

পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়, মানব-সৃষ্টির প্রথমে পুরুষই সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর পুরুষ যখন আপনাকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিল, কোন কিছুতেই আনন্দ লাভ করিতে পারিল না, তখন সে আপনার সত্তার অংশ দিয়া আর একজন গড়িয়া লইল। সেই হইল নারী। বাইবেলে বর্ণিত আছে, ভগবান প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করেন, তাহার নাম আদম। আদম আপনাকে একেবারে সঙ্গীহীন দেখিয়া আপনার পঞ্জর হইতে এক মূর্ত্তি তৈয়ারী করিয়া লইল। সেই হইল আদি নারী ঈভ। এই যদি হয় নারী-সৃষ্টির গোড়ার কথা, তবে নারী যে পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক বলে দুর্ব্বল হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি এবং ইহা ক্ষোভের বিষয়ও নহে।

নারী পুরুষের সাথী। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়—উভয়েরই সত্তা সমান। অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী, সহধর্ম্মচারিণী প্রভৃতি কথা হইতেই বেশ উপলব্ধি হয় যে, পুরুষ নারীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে নাই, নারী পুরুষেরই একাবয়ব।

নারী শক্তির আধার। পুরুষের জ্ঞান নারীর শক্তির সহায়ে পূর্ণতা লাভ করে, সফল হয়। নারীর আছে সৃজন-শক্তি ও সেই সঙ্গে সংগঠন-শক্তি। শক্তির আধার হইলেও নারী স্থির, ধীর ও সহিষ্ণু। নারীর

---

(১) নানা নারীং নিষ্ফলা লোকযাত্রা—বোপদেব।

শক্তির কার্য্যকারিতা খুব বেশী। নারীর শক্তি পুরুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছাইতে পারে, আবার নারীর শক্তি তাহাকে অবনতির গভীর গহ্বরে লইয়া যাইতে পারে।

নারী আপনার অন্তরে যাহাকে একবার স্থান দেয় তাহাকেই ধরিয়া থাকিতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। ইহাই তাহার সতীত্ব। নারী যাহা পায় তাহাকে সে প্রাণের সহিত মিশাইয়া লইতে চায়। যাহার সহিত নারীর প্রাণের যোগ নাই তাহাকে লইয়া সে জীবন-যাত্রা চালাইতে পারে, নৈতিক বোধও অক্ষুন্ন রাখিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে পারে। কিন্তু অমিলনাত্মক মন প্রায়ই সতীত্বের দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরে।

নারীর বৈশিষ্ট্য তাহার বৈচিত্র্যে। নারী যেমন অবলীলাক্রমে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে, পুরুষ তেমন সহজে পারে না। নারী স্বভাবতঃই রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এই রূপের পরিবর্ত্তন তাহার বাহিরের জিনিষ, হয়ত অন্তরের নয়। এই বিচিত্র শক্তির সহায়ে বিপরীত জিনিষের সঙ্গে নারীর যোগ সরলভাবে সম্ভব। তাহাতেই নারী জটিল, তাহারই জন্য সে মহতী। এই জটিলতা বজায় রাখিতে গিয়া সে সৌন্দর্য্যের সহজ উপাসক। একই নারী পত্নীরূপে স্বামীর কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়, মাতৃরূপে সন্তানের নিকট সকলের চেয়ে বেশী আপনার, আবার সেবাধর্ম্মে আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হৃদয়াকর্ষক। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সেই মায়াবিনী নারী হয়ত বা সকলের, নয়ত বা কাহারও নয়। এই স্বাভাবিক জটিলতার জন্য নারী যেমন বহুস্থানে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, তেমনি সে আবার অনেক ক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক উপায়ে অনায়াসে মিটাইয়া ফেলিতে পারে।

নারী সৌন্দর্য্য-প্রিয়। সুন্দর আবেষ্টনীর মধ্যে না থাকিলে নারীকে সুশ্রী দেখায় না। নারীকে লইয়াই রসকলার সৃষ্টি। প্রকৃতিতে যাহা

জ্ঞেয় তাহা সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির আনন্দ। প্রকৃতির পশ্চাতে যে-জ্ঞান তাহা জ্ঞানানুভূতির আনন্দ। মানুষের কাছে জীবন অনুভূত একটি সঙ্গীত-ধারা। নারী এই সঙ্গীতের সঙ্গতি-তান-লয়-মূর্চ্ছনা। পুরুষ এই সঙ্গীতের রূপ। নারীর প্রকাশ যেমন মধুর, পুরুষের অপ্রকাশ তেমনই সুন্দর। সেই জন্য শিল্পীর কাছে নারী ধরা দেয় এবং পুরুষ অদৃশ্য হইয়া যায়। শিল্পীর যত রঙ ও রেখা নারীকেই কেন্দ্র করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ-ভূষায় ও সাজ-সজ্জায় নারী দ্যুতিময়ী। নারীতেই রূপ, নারীতেই ভালবাসা। যত কিছু রূপরস সব নারীতেই সম্ভব। সেই জন্য নারীই শিল্পীর লক্ষ্য। নারীর মোহ শুধু পুরুষকেই আচ্ছন্ন করে না, এক নারী অন্য নারীকেও এই মোহের দিক্ দিয়া পাইয়া বসে। সৌন্দর্য্য-মোহে আচ্ছন্ন করে বলিয়াই নারী-চরিত্র চিত্তাকর্ষক। পুরুষ নারীর মূল স্বরূপ হইয়া তাহার পৌরুষত্ব বজায় রাখিয়াছে এবং নারীর বৃদ্ধিলাভের সমস্ত রস যোগাইয়াছে। সেই জন্যই নারী ফুলের মধু তাহারই বুকের মাঝে লুকাইতে পারিয়াছে এবং সেই জন্যই সে কচি পাতার সরস স্নিগ্ধতা ও ফলভারের গুরুত্ব একাধারে সুন্দর ভাবে রাখিতে পারিয়াছে। সেই জন্যই নারীর 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'। আবার যে নারী দ্বন্দ্ব-সমবায়ে মহতী—তৃষ্ণায়, বিতৃষ্ণায়, কোমলতায়, কাঠিন্যে, আকাঙ্খার গুণ-সম্ভারে, আশঙ্কার ভীতিজালে, পূর্ণতায় ও শূন্যতায় যাহার সত্তা অনবদ্য—সেই নারীরই 'গুণে মন ভোর'। এ নারী শিল্পীর নয়, কবির নয়, পুরুষের আসক্তির নয়। এ নারীর সৌন্দর্য্য সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র সকলেরই উপ-ভোগের জন্য, হয়ত বা কাহারও নয়, এ শুধু ছলনা, কেন না, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। কিন্তু কি বলিতেছিলাম—আর্ট, সেও ত আর্টিফিস, কলা,—সে ত ছলনারই নামান্তর।

নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব

একটা কথা অনেকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার রচিত গল্পে, উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলির প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির প্রতি দরদটা একটু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে, এতটা না হইলেই ভাল হইত। এই সম্পর্কে যে নারী-চরিত্রগুলি অধিক আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, সেগুলির মধ্যে 'দেবদাসে'র পার্ব্বতী, 'শ্রীকান্তে'র অন্নদা, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী, কিরণময়ী ও 'শেষ প্রশ্নে'র কমলই উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্র-গুলির সম্বন্ধে পরে সম্যক্ আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু এই সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর একটা যে অভিযোগ শোনা যায়, তাহা এই— তিনি সমাজের ঘৃণিতা, পতিতা, নিপীড়িতা নারীদিগের চরিত্র গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহাদিগকেই হৃদয়ের দরদ দিয়া নায়িকার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখন শরৎচন্দ্র নারীর প্রতি পক্ষপাত করিয়াছেন কিনা এবং পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকিলে তাহা কতখানি যথা বা অযথা তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের পক্ষপাতিত্বের কথা বহু দিন হইতেই শোনা যাইতেছে। তখন 'শেষ প্রশ্ন' আর তাহার কমল লোকচক্ষে আসে নাই। যাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতেই নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের পক্ষপাতের কথা বলিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের অনেকেই একটু বেশী রকমের সংরক্ষণশীল এবং প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারের একান্ত অনুগত। মোট কথা গোঁড়া। যাঁহার লেখনী হইতে 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' বাহির হইয়াছিল তাঁহারই

হাত দিয়া যে একদিন কমল-চরিত্র আত্ম-প্রকাশ করিবে—একথা যে তখন কেহ চিন্তা করেন নাই তাহা নয়। গোঁড়া সম্প্রদায়ের মনের কথা এই যে, যৌবনের মূঢ়তা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি কেবলমাত্র দরদ দেখাইয়া অর্থলাভ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিবার জন্য পাপাসক্ত ব্যক্তিরাই চতুরতা সহকারে স্বাধীন প্রেমের জটিল ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। তাঁহারা মনে করেন, মনস্তত্ত্বের যে কতকগুলি অনুমানের উপর বর্ত্তমান যুগের প্রেমতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তাহাই যদি জাতির চরম পরিণতি হয়, তাহা হইলে যৌন-আকর্ষণকেই এই বিশ্বের গতি-শক্তি বলিতে হয়। জড়বাদীদের মতে যৌন-আকর্ষণই জীবনের প্রধান কথা এবং ইহা উন্নতির অন্যতম শক্তি। কিন্তু প্রাচ্যদেশীয়দিগের নিকট আত্মা ও উচ্চাঙ্গের প্রেমের স্বাধীনতাই জীবনের লক্ষ্য। যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না তাঁহাদের নিকট এ-সব বস্তু উপহাসের সামগ্রী। মানব যখন জীবন-লীলার নির্দ্দিষ্ট সীমা ও নিয়মের মধ্যে থাকিয়া সাংসারিকভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট জীবনের পরম সত্যের রহস্য অর্থহীন। অন্যান্য সমাজের মধ্যে পরিণয়ের পদ্ধতি জাতির পরিণতি-লাভের উদ্দেশ্যে একটা চুক্তি মাত্র। হিন্দুগণ বিশ্বাস করে যে, পরিণয় আত্মার উন্নতির জন্য বিধাতৃ-বিধান এবং এই বিশ্বাসেই তাহারা দৈহিক মিলন ও মানসিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলে। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এই ধারণা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। জড়বাদীরা আত্মার আকর্ষণ অস্বীকার করিয়া যৌনবৃত্তির দুর্ব্বার আকর্ষণে উদ্দাম হইয়া ছুটিতে চায়। আবার এই জড়বাদীরাই, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীকার করে। এখানে আমাদের কথা এই যে, বিজয়া ও নরেন্দ্র, পার্ব্বতী ও দেবদাস, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত—ইহাদের মধ্যে কি আমরা পরস্পরের আত্মার স্থায়ী আকর্ষণ লক্ষ্য করি না?

সংরক্ষণশীল-সম্প্রদায় একথাও বলেন, সংযত প্রেমই মুক্তির আনন্দ দেয় এবং এই প্রেমই উভয়কে মিলিত করে। আজ লোকে প্রকৃত মিলন ভুলিয়া মুক্তির যে-স্বরূপের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে তাহা পাপাসক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ ইহাতে যৌনবৃত্তিরই পরিতৃপ্তি হয়। ইহা কেবলমাত্র ক্ষণিক দৈহিক সুখ। সংযমহীন শিক্ষা মানেই পাপের প্রশ্রয়। কিরণময়ী ও কমল উভয়েই শিক্ষিতা; তবু ভাল, তাহারা তাহাদের পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কোন ছল অবলম্বন করে নাই। কিরণময়ী তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য ও চিত্তের সুস্থতা রক্ষার জন্যই অপরের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছিল।

প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া মানে কামনাকে খোঁচাইয়া তোলা নয়, বরং দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত রাখা। রাজলক্ষ্মী ভালবাসিয়াই সুখ পায়। এই সানন্দ প্রীতি চিরকালের জন্য অন্তরের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। ইহাই হইতেছে বৈষ্ণব-সাহিত্য। ভাবে কাজে মুক্তি আনিয়া দেওয়া সাহিত্যের কাজ—এই রকম কথা আজকাল প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি অর্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। হিন্দুদিগের মতে প্রেমের মুক্তি মানে নিস্পৃহতার মুক্তি—প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ। এই জন্যই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিতে চায়।

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের উপর নির্ভর করে। কিন্তু উভয়ের চিন্তা-কার্য্য বিভিন্ন। মনের কার্য্য, পরিবর্ত্তন, অবস্থা প্রভৃতি বিশেষভাবে অবগত হইয়া চিত্রিত করিবার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক নগ্ন ব্যাপারও প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবি, ঔপন্যাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের আদর্শবাদী হওয়া উচিত। সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহারাও মনের গতিবিধি লক্ষ্য করেন, চিন্তা করেন সত্য, কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের ন্যায় তাঁহাদের নগ্ন চিত্র প্রকাশ করা চলে না, মাত্র জনকয়েক তত্ত্বানু-

সম্বিৎসুকে লইয়া বিজ্ঞানের কারবার। কিন্তু যে সমাজে সাধারণের ও সমষ্টির কারবার, সেখানে বিজ্ঞানালোচনার অজুহাতে নগ্ন চিত্রের খোলা খেলা দেখান উচিত নয়।

প্রত্যেকেরই আদর্শের সম্বন্ধে সচেতন থাকা আবশ্যক। কারণ, আদর্শ যে ভাবধারার সৃষ্টি করে তাহা পুনরাবর্ত্তিত হইয়া একটা স্থির নিয়ম বা সংস্কারে পরিণত হইয়া যায়, তখন তাহা মন্দ বলিয়া বুঝিলেও আর সহজে উন্মূলিত করা যায় না।

চিরাগত সংস্কারের প্রতি আস্থাবান সংরক্ষণশীলদিগের কথায় মনোযোগ দেওয়াও আবশ্যক। কারণ, যদি নিয়মের বন্ধন সামান্য পরিমাণেও শিথিল করা হয়, তাহা হইলে দুষ্কার্য্যের প্রবাহ ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। এই বন্ধনই ভোগের ক্লান্তি অপনোদনের পক্ষে প্রকৃতির রক্ষাকবচ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই যদি ভোগের বিষয় হয়, তাহা হইলে ভোগের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য সংযম অতি আবশ্যক। শিক্ষাগত মনস্তত্ত্বের (educational psychology) ফলে আমরা শারীরিক কঠোর শাসনের ব্যবস্থা রহিত করিয়াছি বটে, কিন্তু আত্ম-শাসনের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত করিয়াছি। যাহারা শিক্ষালাভ করে, কিন্তু আত্ম-সংযমের শিক্ষা পায় না, তাহারা কেবলমাত্র প্রবৃত্তির বশে চালিত হয়, ইহা সুনিশ্চিত। সেই জন্যই বলিতে হয়—রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কথার সত্যতা বড় কম নয়। আর যাঁহারা ভাবে কাজে মুক্তি আনিতে চান তাঁহাদের সব চেয়ে বেশী ঝোঁক এই গোঁড়াদেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা। তাঁহারা কোন দিন না বলিয়া বসেন, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই চরিত্র এবং প্রবৃত্তির বশে চালিত হওয়াই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। অন্নদা-দিদির বন্ধনহীন প্রেমের আলোচনা করিলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিরূপে সে তাহার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে দমন করিতে পারিয়াছিল,

এবং দারিদ্র্য ও লজ্জাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে-প্রেমের বলে সে দুঃখ-যন্ত্রণা জয় করিতে পারিয়াছিল তাহা কি মুক্ত উদার প্রেম নয়? সে স্বধর্ম্মত্যাগী স্বামীর ধর্ম্মকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়াছিল। ইহাতেই তাহার সত্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, সতীত্ব ও মহান্ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যই শরৎ-সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা যায়, তাঁহার সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলি যে-ভাবে পাঠকের সম্মুখে সজীব হইয়া দাঁড়ায় পুরুষ-চরিত্রগুলি সে-ভাবে দাঁড়ায় না। স্রষ্টা যে সহানুভূতি ও দরদ দিয়া নারী-চরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, পুরুষ-চরিত্রগুলির অঙ্কনে তাঁহার সে সমবেদনা ও শক্তি দেখা যায় না।

শরৎচন্দ্র নিপীড়িত যৌনবৃত্তির খোরাক স্বরূপ যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এখন সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কমলের মুখ দিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই নারীর উচ্ছৃঙ্খলতার পোষক হইয়াছে। কিন্তু তিনি কমলকে এমন-ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে, সে তাহার মনের সাম্যভাব হারায় নাই। ফন্দি অবলম্বন করিয়া, ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, সৎসাহস ও সৎকার্য্যকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া সমাজের উন্নতি হয় না। শরৎচন্দ্র কি যুগপৎ সময়সেবী অথচ শিল্পী ও কবি হইতে চান—দুই বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চাতুরী মাত্র।

আমাদের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে মনস্তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ হয়। বৈজ্ঞানিক সংঘর্ষশীল প্রবৃত্তিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাদের কার্য্যবিধি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মনস্তত্ত্ববিদ্ সত্যোপলব্ধির গর্ব্বে স্ফীত, কিন্তু দার্শনিক আমাদের বৃথা গর্ব্ব ও নির্ব্বুদ্ধিতা উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। আমাদের কি করা উচিত তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া সমাজতত্ত্ববিদ্‌দিগের কাজ। কাব্য ও শিল্প মনস্তত্ত্বের

সত্যকে রূপায়িত করে, কিন্তু দার্শনিকের সাহায্য ব্যতীত অর্থাৎ তাহার মূলগত ও বৃহত্তর সত্য ব্যতীত ইহার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারে না। কারণ দার্শনিকই জীবনের প্রকৃত সত্য ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। শিল্পী, কবি ও বৈজ্ঞানিক শরৎচন্দ্রের কথা পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে যেমন শিল্প প্রভৃতির অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তেমনি মনস্তত্ত্বের গবেষণার দ্বারা মানব সমাজের সুখ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের বহু স্থানে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের চেষ্টা সুন্দর হয় নাই, তাহার পশ্চাতে ছদ্ম স্বার্থ ও নিপীড়িত যুবক-মনের পরিতৃপ্তির বাসনাটা জাগ্রত ছিল মনে হয়।

সত্যই শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্রের সম্মুখে পুরুষ-চরিত্র অনেকখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে। 'অরক্ষণীয়া' গল্পে 'দুর্গামণি ও ভামিনী (পোড়াকাঠ) যে-ভাবে পাঠকের সম্মুখে হাজির হয়, প্রিয়নাথ ও শম্ভু চাটুজ্যে তাহার কাছে অত্যন্ত ম্লান দেখায়। জ্ঞানদা যে-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার কাছে অতুল তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। 'দর্পচূর্ণ' গল্পে বিমলা যে-রকম ফুটিয়াছে গগন-বাবু সে-রকম ফুটে নাই। 'নিষ্কৃতি' গল্পে শৈল যেমন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রমেশ তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তা' ছাড়া নারী-চরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই বোধ হয়, সেগুলির প্রতি লেখকের মনোযোগ সমধিক। তবে সমস্ত নারী-চরিত্র বিচার করিলে শরৎচন্দ্রকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা চলে না। অধিকাংশ গ্রন্থেই তিনি নারীকে তাহার যথোচিত স্থানে বসাইয়াছেন, তাহাতে চিরাচরিত প্রথাকে একটু ডিঙ্গাইয়া যাওয়া হইয়াছে। পুরুষ-চরিত্র হয়ত ঠিকই আছে, তাহাদিগকে হিসাব করিয়া বা দরদ দিয়া বড় করিয়া অঙ্কিত করা হয় নাই। কাজেই অনেক স্থলে

নারী-চরিত্রগুলি লোকচক্ষে যেন একটু বড় রকমে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠিক এই কারণেও লেখকের উপর অভিযোগ আসে না। তিনি 'চরিত্র-হীনে' কিরণময়ী, 'গৃহদাহে' অচলা, 'শেষ প্রশ্নে' কমল প্রভৃতি কয়টি চরিত্র এমন ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সেগুলি যে কেবলমাত্র প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে তাহা নহে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে স্থানে স্থানে মানব-সমাজের অহিতকর হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই মূলতঃ নারীর প্রতি সহানুভূতির জন্য শরৎচন্দ্রের প্রতি ততটা অভিযোগ নয়—যতটা এই অভিনব উপরি-উক্ত নারী-চরিত্র বাংলা-সাহিত্যের মধ্যে আমদানী করিয়া তাহাদিগকেই আবার অন্যায় আস্কারা দেওয়ার জন্য। এইখানেই নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের পক্ষপাতকে অযথা বলা হয়। কথাটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়ার মত নহে।

কিন্তু দুঃখ এই যে, যাঁহারা শরৎচন্দ্রের উপর নারীর প্রতি পক্ষ-পাতিত্বের দোষ আরোপ করেন, তাঁহারা তাঁহার সৃষ্ট পুরুষ-চরিত্রগুলির প্রতি একেবারে দৃষ্টিপাত করেন না, অন্ততঃ যেখানে দৃষ্টিপাত করা উচিত সেখানেও তাঁহারা পক্ষপাত করিয়া দৃষ্টিপাত করেন না। শরৎচন্দ্রের পুরুষ-চরিত্রগুলির মধ্যে 'দর্পচূর্ণে'র নরেন্দ্র, 'পল্লী-সমাজে'র রমেশ, 'স্বামী' উপন্যাসের ঘনশ্যাম, 'নিষ্কৃতি' গল্পের 'গিরিশ, 'গৃহদাহে'র মহিম, 'শেষ প্রশ্নে'র রাজেন্দ্র, 'শ্রীকান্তে'র ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, বজ্রানন্দ 'বিপ্রদাসে'র বিপিন—আমাদের দৃষ্টি সমধিক আকর্ষণ করে। নরেন্দ্র সহনশীল। তাহার পত্নীর যে-ব্যবহার অধিকাংশ সাধারণ মানুষ সহ্য করিতে পারে না, সে সাধারণের একজন হইয়া তাহাই সহজভাবে সহ্য করে। সে পত্নীর ব্যবহারে পীড়িত হইলেও পত্নীর সহিত কথা কাটা-কাটি করিয়া তাহার অসন্তোষ বাড়াইতে চায় না। রমেশ পরহিতে আপনার

স্বার্থ অম্লানভাবে বিসর্জ্জন দিতে পারে। ঘনশ্যামও নরেন্দ্রনাথের মত মানুষ। সে নিজের সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে না এবং তাহার সুখের জন্য আর কেহ কিছু করিতে গিয়া সংসারের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টির সহায়তা করে তাহাও সে চায় না। গিরিশ একেবারে খোলাভোলা পুরুষ। তাঁহাদের সংসার তাঁহারই আয়ের দ্বারা চলিতেছে অথচ খরচ কি ভাবে হইতেছে, অপব্যয় হইতেছে কিনা সে-দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। এমন কি, পত্নী সিদ্ধেশ্বরী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও সে-দিকে তিনি মন দিতে পারেন না। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রতি প্রীতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রমেশ ব্যবসায়ে চারি হাজার টাকা নষ্ট করিয়া ফেলিলেও গিরিশ আবার তাহাকে আট হাজার টাকা দিতে চাহিলেন। মহিম অচলাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। অচলা তাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি মহিমের কোন অভিযোগ নাই। এমন কি, অচলা যখন তাহারই মুখের উপর সুরেশকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল— 'যাহাকে ভালবাসি না তারই ঘর ক'রতে তোমরা এখানে আমাকে রেখে যেও না', তখনও মহিম তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই। সুরেশ যে অচলাকে লইয়া মাঝপথে সারিয়া পড়িয়াছিল তাহা মহিম জানে, অথচ সুরেশের মৃত্যুর পর অচলার সহিত মহিমের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহাতে আর যাহাই প্রকাশ হউক না কেন, ঘৃণা প্রকাশ পায় না। অথচ মহিম দুর্ব্বল-চিত্ত পুরুষ নয়। সে কোন বিষয়ে একবার 'না' বলিলে তাহাকে আর 'হ্যাঁ' বলাইতে পারা যায় না, আবার 'হ্যাঁ' বলিলে 'না' বলাইতে পারা যায় না। যে মহিম এতখানি দৃঢ়, তাহার পক্ষে পত্নীকে দ্বিচারিণী হইতে দেখিয়া নির্ব্বিকার থাকিবার কারণ কি ? প্রেমাস্পদের তৃপ্তিতেই আপনার তৃপ্তি—এই বাক্যের যাথার্থ্য

মহিমের চরিত্রে যেন অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। মহিম অচলাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া তাহারই দ্বারায় সে আপনার তৃপ্তিটুকু সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া লইতে চায় না। অচলার যাহাতে তৃপ্তি হয়, সে যেন তাহাতেই সায় দিয়া থাকে। এ-দিক দিয়া মহিমকে আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংসার-যাত্রায় এ জাতীয় চরিত্রের প্রায় মূল্য হয় না। বরং দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষা করা হয়। শ্রীকান্তও একেবারে খোলাভোলা মানুষ, কোন বন্ধনই তাহাকে একস্থানে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। সে সংসারের প্রতি উদাসীন, অনাসক্ত। তাহার সম্মুখে রাজলক্ষ্মী আপনার অন্তরের প্রীতি-ডালি উজাড় করিয়া ধরিয়া দিয়াছে। শ্রীকান্তও রাজলক্ষ্মীর আদেশ এড়াইতে পারে না। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ভালবাসাও তাহাকে একস্থানে ধরিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। শ্রীকান্ত যেন নির্ব্বিকার পুরুষ। শ্রীকান্তকে আদর্শ চরিত্র বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহার পর শ্রীকান্ত তমঃপ্রধান অভয়া, রজঃপ্রধান কমললতা ও স্বত্ত্বপ্রধান রাজলক্ষ্মী—এই তিন জনের কাহার সহিত কি ভাবে সমন্বয় সাধন করিবে—তাহা অনুমান করা সুকঠিন। কিন্তু এ জাতীয় চরিত্রের মূল্য ব্যবহারিক জীবনে আশা করা যায় না। এ জাতীয় চরিত্র ভাবরাজ্যে (theory) চলে, বস্তুতঃ, সংসারে অচল। সেইজন্য এই সব চরিত্র সংসারী সাধারণ লোকের অবোধ্য—অধিগম্যের বাহিরে। এইজন্য পুরুষ-চরিত্রের প্রতি শরৎচন্দ্রের অনাদরের কথা এত অধিক পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। বজ্রানন্দ আর এক আদর্শ চরিত্র। সে ধনীর সন্তান, স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। কিন্তু সে স্বীয় সাংসারিক সুখের সাধনায় অনাসক্ত। তাহার নির্লিপ্ততা শ্রীকান্তের মত নহে। সে সংসার-সুখের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাংলার দীন পল্লীর দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীকরণের দিকে দৃক্‌পাত করে। সে বীরভূমের সেবা করিবার জন্য

গৃহ ছাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার একটা কথা ভুলিবার নয়। সে রাজলক্ষ্মীকে বলিতেছে, "আপনাদের সবাইকে চিন্‌ব ব'লেই ত ঘর ছেড়ে আসা"—৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৩য় পর্ব্ব, শ্রীকান্ত।

তারপর বিপ্রদাস আত্মসংযম, সাধনা ও শূন্য হৃদয়ের প্রতীক। বিপ্রদাস বিত্তশালী, শক্তিশালী। গিরিনির্ঝরের মত তাহার নিজের পথ নিজেকে কাটিতে হয় নাই। তাহার ধ্যানমৌন বিরাট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, সুগভীর প্রাণ, শান্তি-গাঢ়-উদারতায় উদাসীন অথচ নিষ্ঠা ও আয়াসের দ্বারা দৃঢ় চিত্ত বাহ্যতঃ ব্যবহারিক জগতের উপযুক্ত, কিন্তু বস্তুতঃ নয়। বিপ্রদাস সহিষ্ণু, কিন্তু সকল বাধা সহিতে পারিল না। শশধরের ব্যবসায়-সংক্রান্ত জালজুয়াচুরির আবিষ্কার মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে অসংযত করিল। দোষীর দণ্ডবিধানে তাহার রোষদীপ্ত মূর্ত্তি অকস্মাৎ প্রতিভাত হইয়াছিল এবং এইজন্যই সেদিনের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একপ্রকার লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। অবশ্য, ইহা আকস্মিক হইলেও মনোজ্ঞান-বহির্ভূত নয়। বিপ্রদাসের পত্নী সতী ছিল সাধ্বী। তাহার ত্রুটি না ছিল রূপে, না ছিল গুণে। কিন্তু বিপ্রদাস এত ঊর্দ্ধে ছিল যে, সতীর সাধ্য ছিল না তাহার নাগাল পায়। সেইজন্য উভয়ের দিক দিয়াই পারিবারিক জীবন একান্ত সুখময় হয় নাই। বিপ্রদাস যেন অনেকটা a desert island in human guise এর মত।

ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে আদর্শ চরিত্র—যাহা বর্ত্তমান যুগে একান্ত দরকার তাহা কিছু অঙ্কিত করিলে শরৎচন্দ্রকে বোধ হয় এভাবে কটূক্তি শ্রবণ করিতে হইত না। শরৎ-প্রতিভাই বর্ত্তমান সময়ে এই বিষয়ে উপযোগী। তিনি যে আজ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী আদর্শ পুরুষ-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই এবং তাহা যে একেবারে

ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্যবশতঃই—ইহাই ক্ষোভের বিষয়। আমাদের আরও ক্ষোভের বিষয় এই যে, ইন্দ্রনাথের মত চরিত্র মাঝপথে সরিয়া গেল, অসমাপ্ত রহিল তাহার কর্ম্মময় জীবন। শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া পুরুষ-চরিত্রের আদর্শ সত্যই ব্যবহারিক জীবনের উপভোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য একটিবার মাত্র প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কেন যে তাহাকে মাঝপথে বিসর্জ্জন দিলেন তাহার কারণ উপলব্ধি করা যায় না। তবুও এই সম্পর্কে যে সমস্ত কথা মনে পড়ে তাহা এই স্থানে আলোচনা করিতেছি।

বর্ত্তমান যুগে সুরুচি, সুমতলব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সেই সঙ্গে আত্মসংযম পরিশ্রম, বীরত্ব ও সৎসাহসের অভাব দেখা যায়। সৈন্যবিভাগে, নৌ-বিভাগে আমাদের কার্য্যকৌশল দেখাইবার কোন সুযোগ নাই। মুষ্টিমেয় শাসকের সুবিধার জন্য অসংখ্য শাসিতের সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়, ইহাই এদেশের লোক বরাবর জানিয়া আসিয়াছে। এদেশে যৌনবৃত্তি অন্যায়পূর্ব্বক নিপীড়িত হয় এবং প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যৌন পাপ ও ব্যাধি দেখা যায়। ফলে আত্মসংযমের শিক্ষা ব্যর্থ হয়। যেখানে সমাজের অবস্থা এই রকম, সেখানে ইন্দ্রনাথের মত আদর্শ চরিত্র বিশেষ স্থায়ী ফলদায়ক হইয়া উঠিতে পারিবে না বলিয়াই বোধ হয় তাহাকে শরৎচন্দ্র মধ্যপথে সরাইয়া দিলেন।

আমাদের মনে হয় ইন্দ্রনাথ-চরিত্র ব্যর্থ হয় নাই। ইন্দ্রনাথের চরিত্রে ছিল—সজীবতা, সাধনা, বিপদে ধৈর্য্য, রোগে নির্ভীকতা, শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা, প্রয়োজন হইল নিজের আত্মীয়-স্বজন হইতে বিয়োগে ঔদাসীনতা। ইন্দ্রনাথের চরিত্রের এই গুণগুলি শ্রীকান্তের চরিত্রে প্রতিফলিত দেখা যায়। শ্রীকান্তও ইন্দ্রনাথের মত জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সব কিছুই অনাসক্ত ও নির্ভীক ভাবে অতি সহজে ছাড়িয়া

চলিয়া যাইতে পারে। ইন্দ্রনাথ আদর্শ সৃষ্টি। তাহার আনন্দদায়ক দুঃসাহসিক কার্য্য, দলগঠনে দক্ষতা, বিরাট ব্যক্তিত্ব, ত্যাগে তৃপ্তি, প্রতারণা ও মিথ্যার প্রতি কশাঘাত—এই সমস্ত গুণই তাহার সঙ্গী শ্রীকান্তের জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ হইয়াছিল বলা যায়। জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার দ্বারাও যেমন জগতের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তেমনই ইন্দ্রনাথের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকস্মিক ঘটনা আদর্শ পুরুষ শ্রীকান্তের জীবন গঠনে সহায় হইয়াছিল।

ইন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি কথা আমাদের মনে পড়ে। বিবেকানন্দ বলিতেন—প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধ অপ্রকাশ থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধ প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধের ভাবধারা বহন করিয়া চলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধ আমাদের সম্মুখে প্রকাশমান হন।

ইন্দ্রনাথ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ হইয়াও অপ্রকাশ, আবার অপ্রকাশ থাকিয়াও প্রকাশ। প্রেমের যেখানে পূর্ণ প্রবাহ, মিলন সেখানে বিচ্ছেদ ও অভাবময়তার সম্ভাব্য কারণ সৃষ্টি করে। নতুবা, প্রবাহ চলে কি করিয়া? সেই জন্য বলিতে ইচ্ছা হয়, আশ্চর্য্য, হে ইন্দ্রনাথ, তোমার মানবতা! তুমি অদৃশ্য হইয়া গেলে কোথায়? কিম্বা তুমি অদৃশ্য হও নাই, শ্রীকান্তের মধ্যে আকাশের মত সর্ব্ব-মানবের জন্য উদার ও আত্মভোলা প্রেম সংগোপনে রাখিয়া গিয়াছ।

হাঁ, প্রকাশমান সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টির সহায়ক নারী। আমাদের চতুর্দ্দিকে যে বিশাল প্রকৃতি বিরাজমান, নারী তাহারই প্রতীম। নারীই মানব-আত্মার পবিত্র সৌরভ রক্ষা করিয়া থাকে।

শরৎচন্দ্র যেখানে যেখানে একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন সেই সেই স্থানে আমাদের মনে পড়ে,—

The mind has thousand eyes
And the heart but one,
Yet the light of whole life dies
When love is done.

—F. W. Bourdillon.

শরৎচন্দ্র সহস্র চক্ষু ও অন্তঃকরণ দিয়া নারীতে যে-রূপ দান করিয়াছেন তাহাই তাঁহার বাস্তব সৌন্দর্য্যের রসসৃষ্টি। হেগেল বলেন, ভগবানও আপনাকে সুন্দরের রূপে প্রকৃতিতে ও শিল্পে প্রকাশ করিয়াছেন। শরৎ-চন্দ্রেরও মনের কথা কি তাই ?

মাতৃত্বে নারী

মা হওয়াই নারীর নারী-জীবনের সার্থকতা। মাতৃত্বেই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মাতৃরূপই নারীর চরম ও পরম রূপ। মাতৃত্ব যেখানে প্রকাশ পায়, সেখানে নারীর অপরূপ সৌন্দর্য্য সহজ-সরলভাবে ফুটিয়া উঠে। শরৎ-সাহিত্যে যেখানে যেখানে মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নিজের সন্তান অপেক্ষা সম্পর্কীয় বা নিঃসম্পর্কীয় অপরের সন্তানের প্রতি বাৎসল্য-ভাব সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। মাতৃমূর্ত্তির আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ইহাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম—আপনার সন্তানের প্রতি নারীর স্নেহ; দ্বিতীয়—সপত্নীর সন্তানের প্রতি স্নেহ; তৃতীয়—সম্পর্কীয় বা নিঃসম্পর্কীয় অপরের সন্তানের প্রতি স্নেহ।

স্ত্রী-প্রকৃতির হইয়া আপনার সন্তানের প্রতি স্নেহ কেবলমাত্র মনুষ্য-সমাজে কেন, পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবজন্তুর মধ্যেও স্বাভাবিক। মা আপন সন্তানের জীবন রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, জলে ঝাঁপ দিতে পারে, আগুনে পুড়িতে পারে, বাঘ-সিংহের মুখে অসঙ্কোচে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বলি দিতে পারে। সন্তানের প্রতি মাতার আকর্ষণ অতি সহজ ও অতি স্বাভাবিক। এই জন্যই বোধ করি শরৎচন্দ্র আপনার সন্তানের প্রতি স্নেহের বিকাশে মাতৃমূর্ত্তির পরিচয় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান নাই। বরং নানা কারণে যে মাতৃহৃদয় বাৎসল্য-বিবর্জ্জিত হইয়া তিক্ততা ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিতে পারে, তাহার দুই একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 'অরক্ষণীয়া' গল্পে

দুর্গামণি কন্যা জ্ঞানদাকে অনূঢ়া রাখিবার জন্য সামাজিক শাসন, পারলৌকিক অকল্যাণের ভয় আর এড়াইতে পারিলেন না। বিশেষ-ভাবে সামাজিক অনুশাসনের যূপকাষ্ঠে মাথা গলাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইল। এই ভাবে নানা কারণে যে মাতৃহৃদয় হইতে সন্তান-বাৎসল্য দূরীভূত হইতে পারে, ইহা তাহার একটি চিত্র। "বৈকুণ্ঠের উইলে" দেখা যায়, ভবানী যদিও আপন সন্তান বিনোদের প্রতি স্নেহহীনা নন্, তথাপি তিনি বিনোদকে চরিত্রহীন জানিয়া স্বামীর উইলে সম্মতি দিয়া তাহাকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। আপনার সন্তানের প্রতি স্নেহের চিত্র শরৎ-সাহিত্যে অধিক পাওয়া যায় না। তবে এক স্থানে আমাদের অত্যন্ত খট্‌কা লাগে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য জননী সব কিছু সহ্য করিতে পারে—বোধ হয় এই অজুহাতেই শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে' এক অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন। "এম্‌নি স্নেহ-প্রেম-বঞ্চিত হইয়াই সে (কিরণময়ী) নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেও জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল। অঘোরময়ী সমস্ত জানিতেন। তাঁহার রূপসী বধূ যে ইদানীং সতী-ধর্ম্মেরও সম্পূর্ণ মর্য্যাদা বহন করিয়া চলে না, ইহাও তিনি বুঝিতেন। কিন্তু পুত্র মৃতকল্প, অসহ্য দুঃখের দিন আগত-প্রায়, এই মনে করিয়াই বোধ করি বধূর বিসদৃশ আচার-ব্যবহারও উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। যে ডাক্তার হারাণের চিকিৎসা করিতেছিল, সে যে কি আশায় বিনা ব্যয়ে ঔষধ-পথ্য যোগাইতেছে, কেন সংসারের অর্দ্ধেক ব্যয়ভারও বহন করিতেছে, ইহা তাঁহার অগোচর ছিল না।" শরৎচন্দ্র অঘোরময়ীর এই ভাব ও আচরণের কৈফিয়ৎ এই বলিয়া দিয়াছেন, "কিন্তু পীড়িত সন্তানের চিকিৎসার তুলনায় কোন অন্যায়কেই বড় করিয়া দেখিবার তাঁহার সাহসও ছিল না—শিক্ষাও ছিল না,"—ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়তঃ, সপত্নীর সন্তানের প্রতি স্নেহ লইয়া শরৎচন্দ্র যে কয়টি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ চিত্রই মনোজ্ঞ। 'স্বামী' উপন্যাসে দেখা যায়, ঘনশ্যামের বিমাতা ঘনশ্যামের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার না করিলেও তাহার প্রতি ও সৌদামিনীর প্রতি স্নেহের লেশমাত্র প্রদর্শন করেন নাই। ঘনশ্যামের খাওয়া হয় কি না, কি দিয়া খান, তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু ত্রুটি হয় কি না, সে-দিকে তিনি একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। সর্ব্বদা আপন ছেলেমেয়েদের আহার-বিহার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই ব্যস্ত। এমন কি, যখন তিনি তাঁহার ৩০৲ টাকা মাহিনার কেরাণী-পুত্র ও তাহার বন্ধুদিগের আহারের জন্য চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহাদের যথাসময়ে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া না দিলে তাহাদের পিত্ত পড়িয়া সারাদিন আর না খাওয়ার আশঙ্কা করিয়াছেন, তখন তিনি সপত্নী-পুত্র ঘনশ্যামের জন্য 'দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে' দিয়া উপাদেয় আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার দুর্ব্যবহারের এই এক ফলাও চিত্র।

সপত্নীর সন্তানের প্রতি বিমাতার বাৎসল্য-ভাব প্রদর্শনের যে কয়টি চিত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাই একে একে এখন আলোচনা করিতেছি। 'দেবদাসে' পার্ব্বতী শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছে। সেখানে সে সপত্নী-পুত্র মহেন্দ্রকে আপনার স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। মহেন্দ্রকে পাঠাইয়া সপত্নী-কন্যা যশোদাকে তাহার শ্বশুর-বাড়ী হইতে আনাইয়া তাহার সমস্ত অলঙ্কার একটি-একটি করিয়া যশোদার অঙ্গে পরাইয়া দিয়াছে। সপত্নীর পুত্র-কন্যা বলিয়া তাহাদের প্রতি পার্ব্বতীর স্নেহ কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। কে বলিবে যে, পার্ব্বতী তাহাদের গর্ভধারিণী নয়। এইখানেই নারী ছলনাময়ী। পার্ব্বতীর এই ব্যবহার তাহার মাতৃহৃদয়ের প্রকাশের পরিচয় নহে। ইহা তাহার গুপ্ত চিত্তজ্বালা

মিটাইবার এক অভিনব প্রয়াস। পার্ব্বতী প্রকৃত পক্ষে স্বামীর ঘর করিতে আসে নাই। তাহার অন্তরের স্বামী দেবদাস। দেবদাসকে সে হৃদয় হইতে বিদায় দিতে পারে নাই, অথচ আনুষ্ঠানিক বিবাহের দ্বারাই ভুবন চৌধুরী তাহার স্বামী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিবার মত তাহার ক্ষমতা সামাজিক কারণে ক্ষুব্ধ। সে ভুবন চৌধুরীর বাড়ীতে আপনাকে এমনভাবে মানাইয়া লইয়া চলিয়াছে, যাহাতে কেহই বুঝিতে পারে না, যে, এ তাহার প্রকৃত স্বামীর গৃহ নয় বা তাহার হৃদয়তলে প্রেমের আর এক ফল্গু বহিয়া যাইতেছে। শরৎ-চন্দ্রের এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে বোধ হয় 'দেবদাসই' প্রথম রচনা। সেই জন্য তিনিও প্রথমেই পার্ব্বতীর আচরণ লইয়া অধিক বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করেন নাই।

"বড়দিদি' গল্পে বিমাতার আর এক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের "বিমাতাটি নিজের সন্তানের প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও, সুরেন্দ্রের হেফাজতের সীমা ছিল না। থুথু ফেলাটি পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না।" তিনি সুরেন্দ্রকে একেবারে বুকের মাণিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের স্নান, আহার, লেখাপড়া প্রভৃতি সব কাজেরই তিনি তত্ত্বাবধান করিতেন। "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি। এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য নিজের নিদ্রাসুখ বিসর্জ্জন দিতে হইত।" "সুরেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ত্রুটি ছিল না—তিরস্কার-লাঞ্ছনার পর মুহূর্ত্তে তাহার চোখমুখ ছল-ছল করিত। রায়-গৃহিনী (সুরেন্দ্র নাথের বিমাতা) সেটি জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া তিন দিনের জন্য তাহার সাগু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, (পাছে সামান্য অব্যবস্থায় তাহার একটা কিছু

বাড়াবাড়ি অসুখ করিয়া বসে) মানসিক উন্নতি ও শিক্ষাকল্পে তাঁহার আরও তীক্ষ্নদৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রের অঙ্গে পরিষ্কার কিম্বা আধুনিক রুচি-অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই তাহার সখ ও বাবুয়ানা করিবার ইচ্ছা তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত এবং সেই মুহূর্ত্তেই দুই তিন সপ্তাহের জন্য সুরেন্দ্রের বস্ত্রাদি রজক-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।" সুরেন্দ্রের লেখাপড়া সমাপ্ত হইলে একদিন যখন তাহার উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাইবার কথা উঠিল তখন বিমাতাই বাধা দিলেন এবং স্বামীকে বলিলেন, "তবে আমাকেও বিলাত পাঠাইয়া দাও—না হইলে সুরোকে সাম্‌লাইবে কে? যে জানে না, কখন্ কি খাইতে হয়, কখন্ কি পরিতে হয় তাকে একলা বিলাত পাঠাইতেছ, বাড়ীর ঘোড়াটাকে সেখানে পাঠালেও যা, ও-কে (সুরেন্দ্রকে) পাঠানও তাই, ঘোড়া-গরুতে বুঝিতে পারে যে, তার ক্ষিদে পেয়েছে, কি ঘুম পেয়েছে—তোমার সুরো তাও পারে না"। ইহাতে বিমাতা সুরেন্দ্রকে কতখানি সংসারানভিজ্ঞ মনে করেন এবং তাহার উপর তাঁহার কতখানি মাতৃস্নেহ তাহাই সূচিত হইয়াছে। সপত্নী-পুত্রকে কয়জন বিমাতা এমন স্নেহের চক্ষে এমন বাৎসল্যের ভাবে দেখেন?

'বৈকুণ্ঠের উইলে' দেখা যায়, বৈকুণ্ঠ গোকুলকে লেখাপড়া ছাড়াইয়া দোকানে লইয়া যাইতে চাহিলে, বিমাতা ভবানী আপত্তি করিয়া বলিলেন, "যে কথা নয়, সেই কথা। দুধের ছেলে যাবে তোমার দোকান কর্‌তে? সে হবে না—আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার গোকুলকে পড়া ছাড়্‌তে দেব না,"—২য় পরিচ্ছেদ। ভাবটা এই—গোকুল পরীক্ষায় একবার অকৃত-কার্য্য হইয়াছে বলিয়াই যে, সে চিরকালের জন্য বোকা প্রমাণিত হইবে এবং তাহার বিদ্যার্জ্জনের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে এমন হইতে পারে না। কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদ (ভবানীর নিজ পুত্র) চরিত্রহীন

হইয়াছে জানিয়া যখন বৈকুণ্ঠ আপনার কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তির গচ্ছিত-করণের সম্বন্ধে পত্নী ভবানীর নিকটে উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন, তখন ভবানী বলিয়াছিলেন, "ওগো, বিনোদকে তুমি কিছুই দিয়ে যেও না। তোমার গায়ের রক্ত জল-করা জিনিষ আমি কারুকে দেব না। দোকান, ঘর, বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তুমি গোকুলকে লিখে দিয়ে যাও, তুমি শান্ত হও, নিশ্চিন্ত হও, আমি নিজে তার সাক্ষী হ'য়ে থাকব।" ভবানী আপনার পুত্রের আচরণের কথা অবগত ছিলেন। পুত্রের আচরণের কথা ভাবিয়া স্বামী ব্যাকুল হইয়াছেন—ইহা ভবানী জানিয়াছেন। এখন তিনি স্বামীকে নিশ্চিন্ত করিতে চান। ভবানীর এই চিত্ত-ধারার সহিত সপত্নী-পুত্রের প্রতি বাৎসল্য মিশ্রিত হইয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠের উইল প্রণয়নে অগ্রসর করিয়া দিল। ভবানী ত ইচ্ছা করিলেই স্বীয় পুত্রের জন্য সম্পত্তির অংশ ভাগ করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। পুত্রকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিরার জন্য উইলে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে স্বহস্তে নাম সহি করিয়া দিলেন। ভবানী বিশ্বাস করিতেন, গোকুলের হস্তে তাঁহার স্বামীর অতি-ক্লেশার্জ্জিত ধন অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং স্বামী স্বর্গ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া সুখভোগ করিতে পারিবেন। মৃত্যুকালে বৈকুণ্ঠ গোকুলকে বলিয়াছিলেন, "অনেক তপস্যায় এমন মা মেলে, গোকুল!"

'পণ্ডিত-মশাই' উপন্যাসে কুসুমের চরিত্র বিমাতার সপত্নী-সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-বিকাশের আর এক চিত্র। যে-দিন কুসুমের নারী-হৃদয় প্রায় শূন্যই ছিল, সে-দিন যখন তাহার সেই শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন সে এক কঠোর ঝোঁকের বশেই অতি দুঃখে সে-সুযোগ হাত দিয়া ঠেলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে। সে তাহার

শাশুড়ীর-দেওয়া স্নেহের উপহার স্বর্ণবলয় কুঞ্জকে দিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছে। যাহারা একদিন তাহার মাতার স্বভাবের সম্বন্ধে কুশ্রী ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া বৃন্দাবনের আবার বিবাহ দিয়াছিল, তাহাদেরই নিকট হইতে উপহার গ্রহণ তাহার অসহ্য বোধ হইল। এই স্বর্ণ-বলয়ের প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে, একদিন রাসবিহারীর-দেওয়া স্বর্ণ-বলয় বিজয়ার নিকটে 'অত্যাচারের হাতকড়ি' বলিয়া বোধ হইয়াছিল। স্বর্ণ-বলয় ফিরাইয়া দিবার মত দৃঢ়তা কুসুমের ছিল, কিন্তু বিজয়ার ছিল না। যাহাই হউক, কিন্তু যে-দিন বৃন্দাবন বছর ছয়েকের পুত্র চরণকে সঙ্গে লইয়া কুঞ্জর বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সে-দিন সপত্নী-পুত্র চরণকে দেখিয়াই কুসুমের নারীহৃদয়ের অনাস্বাদিত কিন্তু স্বাভাবিক মাতৃত্ব জাগিয়া উঠিল। "চাহিয়া চাহিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু যেন সহস্র বাহু হইয়া উহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল।" সে চরণকে লইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের তলে সুপ্ত মাতৃত্ব আজ জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে ছড়াইয়া দিতে চাহিতেছে। কিন্তু সে জননী হওয়ার সুখ হইতে বঞ্চিত। ইহাই তাহার অতি দুঃখের কথা। সে যদি জননী হওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হইত, তাহা হইলে সেই সুন্দর শিশুই হয়ত তাহার হইতে পারিত। "ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোন মতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না। কিন্তু আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বুঝি আর কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই। বুক যেন তাহার ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান

হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এত বড় অনধিকার সংসারে কার আছে? চরণকে সে যতই বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল, ততই তাহার বঞ্চিত তৃষিত মাতৃ-হৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহার নিজের ধন জোর করিয়া অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।”—পঞ্চম পরিচ্ছেদ। যৌন ক্ষুধায় যে-সত্য সমাহিত মূলতঃ তাহা এই মাতৃহৃদয় লাভ করিবার জন্যই। কুসুম জননী হওয়ার সুযোগ হইতে এতদিন বঞ্চিত থাকিলেও আজ তাহার-মাতৃস্নেহ হৃদয়-দুয়ার ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়। চরণ কুসুমের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে চাহিলে কুসুম তাহাকে বলিল, ‘মা’ না বল্‌লে কিছুতেই ছেড়ে দেব না। চরণ যখন কাঁদ কাঁদ হইয়া ‘মা’ বলিল, তখন চরণকে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুসুমের মাতৃস্নেহ আজ উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যাহার উপর গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে চায়, সে যে তাহার সপত্নী-পুত্র এ-কথা ভুলিবার উপায় নাই। চরণকে আপনার স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিবার, তাহাকে আপনার স্নেহচ্ছায়ে আড়ালে মানুষ করিয়া তুলিবার সুযোগ কুসুম পায় নাই। পাইলে সে নিশ্চিতই এ-বিষয়ে কুণ্ঠাবোধ করিত না। তাহার মাতৃত্ব জাগিয়াও চরণের মৃত্যুতে ব্যর্থ হইয়া গেল।[১] ‘নিষ্কৃতি’ গল্পে শৈলজা সপত্নী পুত্র কানাইলালের প্রতি আপন গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও দরকারবোধে কঠোরতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, সপত্নীপুত্র বলিয়া দুর্ব্যবহার করে নাই। ‘নববিধান’ গল্পেও দেখা যায় ঊষা বিমাতা হইয়া সপত্নী-পুত্র সোমেনকে আপন সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করিতেছে, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনাদরের

(১) A mother, a mother was born in vain.—Alice Maynell.

নিদর্শন নাই। উষার সন্তান-বাৎসল্য অকৃত্রিম। সপত্নী-সন্তানের প্রতি বিমাতার স্নেহ-প্রীতি-করুণা ঢালিয়া দেওয়ার যে কয়টি চিত্র আলোচিত হইল, তাহার সব কয়টিতেই দেখা যায়, সপত্নী মৃত। এই চিত্রগুলির কথা চিন্তা করিলে অনেক সময় মনে হয়, শরৎচন্দ্র পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আগ্রহবান।

বিমাতা সপত্নী-সন্তানকে স্নেহের জালে ঘিরিয়া রাখিলেও আপনার সন্তানের স্বার্থ রক্ষার জন্য সেই স্নেহ-জাল যে তিনি এক সময় কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিতে পারেন তাহার আর এক চিত্র 'বিপ্রদাসে'র দয়াময়ী-চরিত্র। দয়াময়ীর স্নেহ তাহার আপন সন্তান দ্বিজদাস অপেক্ষা সপত্নী-সন্তান বিপ্রদাসের উপরই যেন সমধিক পড়িয়াছে। কিন্তু যেখানে স্নেহের সম্বন্ধ রক্তের সম্বন্ধ, নাড়ীর সম্বন্ধ, সেখানে স্নেহ কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। যে স্নেহে নাড়ীর সম্বন্ধ নাই, রক্তের সম্বন্ধ নাই, তাহা আপনার মত করিয়া দেখাইতে গেলে অনুশীলন আবশ্যক। স্বাভাবিক স্নেহের পাত্র কখনও বিপন্ন হইলে অনুশীলনের স্নেহ দূরে সরিয়া যায়। দয়াময়ী বিপ্রদাসকে যে-স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছেন তাহা অনুশীলনের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা অর্জ্জিত। স্বামী মৃত্যুকালে বিপ্রদাস, দ্বিজদাস ও কল্যাণী এই তিনজনকে দেখাইয়া তাহাদিগকে সমভাবে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-বিধবার স্বামীর আদেশের বড় আর কি থাকিতে পারে? পাছে কোন প্রকারে সপত্নী-পুত্রের প্রতি তাঁহার অনাদর প্রকাশ পায়, সেজন্য দয়াময়ী নিজ পুত্রকে অজ্ঞাতসারে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিজদাসের উপর হইতে তাঁহার মাতৃস্নেহ একেবারে চলিয়া যাইতে পারে না বলিয়াই চলিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু তিনি তাহার উপর আদৌ খুসী নন্। দয়াময়ী বিপ্রদাসকে তাঁহার কৈলাসনাথ মানস-সরোবর যাইবার কথা

বলিতে আসিয়া ছোট ছেলে দ্বিজদাসের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া রহিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "আর পিছনে যে-ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজী নই। বামুনের ছেলে হ'য়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক তো অনেক দিনই ছেড়েছে, শুন্‌তে পাই কলিকাতায় খাদ্যাখাদ্যেরও নাকি বিচার করে না।" "ও আমারই খাবে, আর আমারই টাকায় কলকাতা থেকে লোক এনে আমার প্রজা বিগড়োবার ফন্দি আঁট্‌বে? আমার টাকায় আমার প্রজা ক্ষ্যাপানো?—২য় পরিচ্ছেদ। এই ভাবটা দয়াময়ীর দ্বিজদাসের প্রতি বিরক্তির ভাব, অথচ একেবারে বাৎসল্য-হীনতার পরিচয় নহে। দয়াময়ী বিপ্রদাসের প্রতি যে-স্নেহ দেখাইয়াছেন তাহা হিন্দু পরিবারে একান্ত কাম্য। যে-দিন কন্যা-জামাতা বিপন্ন হইয়াছিল, সে-দিন অনুশীলনের দ্বারা অর্জ্জিত বাৎসল্য ও স্বাভাবিক স্নেহের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। সে-দিন অনুশীলনের শক্তি দুর্ব্বল ও স্বভাবের শক্তি প্রবল প্রমাণিত হইল। সেই জন্য দেখা যায়, দয়াময়ী কন্যা-জামাতার পক্ষাবলম্বন করিয়া বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে গিয়াছেন। অনুশীলনলব্ধ ও কষ্টজাত সংযমকে সময় লইয়া ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ দেওয়া হইল না, কাজেই ইহা আকস্মিক। ইহাকে আমরা দৈববিড়ম্বনা বলিতে শিখিয়াছি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা রুদ্ধ ইচ্ছারই প্রতিক্রিয়া।

তৃতীয়তঃ, রমণীর সম্পর্কীয় বা নিঃসম্পর্কীয় অপরের সন্তানের প্রতি বাৎসল্য। অপরের সন্তানের প্রতি স্নেহ না জন্মানই তো স্বাভাবিক। সেই জন্যই বুঝি সমাজে স্বর্ণমঞ্জরী, দিগম্বরী, কাদম্বিনী, রাসী বামনি শ্রেণীর রমণীই অধিক। কিন্তু যে সমাজে এই জাতীয় নারী সংখ্যায় যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, সেই সমাজে আবার ভামিনী, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতিরও স্থান আছে এবং তাহারাই বোধ হয় এতদিন রমণীর রমণীয়তা

বজায় রাখিয়াছে বলিয়া অনাথ, আশ্রয়হীন ও অভাগাদের স্থান মরুভূমিতে না হইয়া এখনও সমাজেই আছে। রমণীর বাৎসল্য দুঃখার্ত্ত হৃদয়কে স্নেহ-রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া দেয় বলিয়াই জীবনের অসহায় অবস্থায় তথা-কথিত হতভাগ্যের পক্ষে তাল সামলাইয়া লওয়া সাধ্য হয়। বাৎসল্যহীন রমণী-হৃদয় হৃদয় নহে। রমণীর বাৎসল্য দুঃখের ঊষর ভূমিতে সোণার ফসল উৎপাদন করে, সংসার-মরুভূমিকে সরস উদ্যানের রূপ দেয়, দৈন্যের বেশকে সুষমামণ্ডিত করে, দ্বন্দ্বের মধ্যে মিলন ঘটায়, ব্যর্থতার আঁধার গহনে সফলতার বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া ধরে। শরৎ-সাহিত্যে যে সমস্ত নারী বাৎসল্য রসে পাঠকের মনকে সবলে আকর্ষণ করে, তাহাদের মধ্যে তিনজন বয়স্কা মহিলা। এই তিনজন হইতেছেন বিশ্বেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী এবং ভুবনেশ্বরী। নামের সহিতও যে একটা মিল আছে তাহার যোগসূত্র এই—নারীতেই তাঁহারা ঈশ্বরী। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী বিধবা। বিশ্বেশ্বরী সাধারণতঃ এত উচ্চ স্তরে অবস্থান করেন যাহা সাধারণের বোধশক্তির নাগালের বাহিরে। বিশ্বেশ্বরীর নিকটে আপনার পুত্র বেণী যেমন স্নেহের ভাজন, রমেশও তেমনি আদরের পাত্র। তাঁহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই। তিনি বিরোধের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বেণীকে স্নেহ করেন বলিয়া রমেশকে দূরে ঠেলিয়া রাখেন নাই, আর রমেশকে ভালবাসেন বলিয়া বেণীকে তাহার দোষের জন্য কটুকাটব্যও করেন নাই। তাঁহার অন্তরতলে রমেশের জন্য স্নেহের যে ফল্গুধারা বহিয়া যাইত তাহা, আপনার সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহদ্বার রুদ্ধ করিতে পারে নাই। সেই জন্য তিনি, রমেশ ও বেণীর মধ্যে বিরোধ বর্ত্তমান থাকিলেও, স্বয়ং রমেশের বাড়ীতে গিয়া তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবার বিষয়ে আপনার শক্তি অকুণ্ঠিতভাবে নিয়োগ করিয়াছেন। সম্পত্তির ব্যাপার লইয়াই রমেশের

সহিত বেণীর বিরোধ। সেইজন্য সামাজিকতার দিক্ দিয়া যাহাতে উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ বাহিক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই হেতু তিনি বেণীকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য রমেশকে অনুরোধ করিয়াছেন। "হাঁ রে, দেখা হয়নি ব'লে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের উপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু তোর কাজ ত তোকে করা চাই! না, একবার ভাল ক'রে বল্ গে যা, রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হ'তে তোর কোন লজ্জা নেই। তা' ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা, যে, কোন লোকের হাতে-পায়ে ধরে মিটমাট ক'রে নিতেও লজ্জা নেই।"—৩য় পরিচ্ছেদ, পল্লীসমাজ। রমেশ তাঁহারই কথায় বেণীকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল এবং নিমন্ত্রণ করিয়াও ছিল। বেণী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ রমেশের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরকে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। রমেশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিমন্ত্রণ করিবার বিষয়ে বিশ্বেশ্বরীর উপদেশ চাহিতে তিনি তখনও বেণীর মতানুসারে কাজ করিতে রমেশকে উপদেশ দিলেন এবং রমেশ তাহাতে আপনার অস্বীকৃতি জানাইল। বিশ্বেশ্বরী ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং রমেশের ভাঁড়ারের চাবিগোছাটা তাহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে পাঠকের স্বভাবতঃই মনে হয়, বিশ্বেশ্বরী আর রমেশের বাড়ীতে যাইবেন না। রমেশের কাজে স্নেহবশে তিনি সাহায্য করিতে চান, কিন্তু তার পূর্ব্বে বেণীকেও ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু তিনি বাহিরে যে-ভাবই প্রদর্শন করুন না কেন, অন্তরে সামাজিকতার চরণতলে বাৎসল্যভাবকে বলি দেন নাই। সেইজন্য দেখিতে পাই, তিনি শ্রাদ্ধের দিন রমেশের বাড়ীতে আসিয়া স্বয়ং কাজকর্ম্ম তদারক করিতেছেন। তিনি যে একজন বাহিরের সাধারণ লোকের মত কাজকর্ম্ম তদারক করিতেছেন তাহা নহে। রমেশের বাড়ী

যে তাঁহার নিজের বাড়ী এবং এখানেও যে তিনি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—একথা তিনি স্থিরভাবেই জানেন। বিশ্বেশ্বরী রমেশকে বলিতেছেন, "গাঙ্গুলী মহাশয়কে ভয় দেখাতে মানা ক'রে বল, যে, আমি সবাইকে আদর ক'রে বাড়ীতে ডেকে এনেছি—সুকুমারীকে অপমান কর্‌বার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজ-কর্ম্মের বাড়ীতে হাঁকাহাঁকি, চেঁচাচেঁচি, গালি-গালাজ কর্‌তে আমি নিষেধ কর্‌চি। যাঁর অসুবিধা হবে, তিনি আর কোথাও গিয়ে বসুন।"—৪র্থ পরিচ্ছেদ, পল্লীসমাজ। রমার সহিত রমেশের বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে শত্রুতা ছিল। বিশ্বেশ্বরী রমেশকে যেমন স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, তেমনি রমাকেও তিনি কম স্নেহ করেন নাই। তিনি রমাকে আপনার কন্যার মত আদর করিয়াছেন। এমন কি, রমার মাসী আসিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া গেলেও তিনি রমার উপর কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। বিশ্বেশ্বরী আপনার হৃদয়-নিষিক্ত বাৎসল্যরসে আপন-পর শত্রু-মিত্র সকলকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। তিনি রমার অন্তরের জ্বালা মাতৃহৃদয়ের দরদ ও বিশ্বমৈত্রীর সহানুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি গ্রাম হইতে চলিয়া যাইবার সময় রমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন এবং রমেশকে বলিতেছেন—"সংসারে তার যে স্থান নেই, বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানি নে, কিন্তু যদি বাঁচে, সারা জীবন ধ'রে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না, শুধু সমাজের

খেয়ালের খেলা। ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই।”

আপনার সন্তান বেণীর ব্যবহারে বিশ্বেশ্বরী বড় বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। শেষের দিকে তাহার ব্যবহার মাতৃহৃদয় এমন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তিনি দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আর তার একটা কৈফিয়ৎ এই বলিয়া রমেশকে জানাইতেছেন,—“এখানে যদি মরি, রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে; সে হলে তো কোন মতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা তো জ্বলে জ্বলেই গেল, বাবা, পাছে পরকালটায়ও এম্‌নি জ্বলে পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়েই পালাচ্ছি, রমেশ।”—শেষ পরিচ্ছেদ। বিশ্বেশ্বরীর বৈধব্য-জীবনের যে বিশ্বমৈত্রী ভাব তাহারই একাংশ এই বাৎসল্যে নবীভূত হয়।

‘নিষ্কৃতি’ গল্পে সিদ্ধেশ্বরীর বাৎসল্য উপভোগ্য। সিদ্ধেশ্বরীর নিকটে নিজের সন্তান ও অপরের সন্তান বলিয়া কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি বাড়ীর সব কয়টি ছেলেকেই আপনার স্নেহরসে একেবারে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। ছেলেরা দোষ করিয়া কাহারও কাছে শাস্তি পায় ইহাও তিনি দেখিতে পারিতেন না। এই ছেলেগুলির দৌরাত্ম্যের জ্বালায় প্রত্যহ রাত্রে তাঁহার সুনিদ্রা হইত না। অথচ তিনি ছেলের দলটিকে সঙ্গে না লইয়া শয়ন করিতেও পারিতেন না। শৈল যখন তাহার নিজের সন্তান ও সেই সঙ্গে সপত্নী-সন্তান কানাইকে লইয়া গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গেল, তখন সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃহৃদয়ের খানিকটা যেন বড় শূন্য বোধ হইল। তিনি কানাইকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিতান্ত সারল্যের বশে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছেন তাহা হাস্যকর। তিনি উকিলের চিঠি দিয়া টাকাকড়ি আদায়ের মত ছেলে আদায় করিয়া লইবেন—এইভাবে দ্বারবান দিয়া উকিলের চিঠি শৈল ও

রমেশের নিকট পাঠাইবার জন্য দেবর হরিশকে বলিতেছেন, এমন কি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পাইলে নালিশ করা হইবে এ কথা জানাইয়া দিতেছেন। শৈল সম্বন্ধে সিদ্ধেশ্বরীর ছোট জা, কিন্তু শৈলর প্রতি ব্যবহারে সিদ্ধেশ্বরীর জা-প্রীতি যতটা না প্রকাশ পাইয়াছে, বাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। শৈল সিদ্ধেশ্বরী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। সিদ্ধেশ্বরী শৈলর হাতে সংসারের সব ভার সমর্পণ করিয়া দিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী ছিলেন অত্যন্ত সরল। তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। তিনি ছিলেন ঠিক্ পাঁকের খুঁটির মত। সেইজন্য যখন হিংসুক নয়নতারা আসিয়া তাঁহার কানে শৈলর বিরুদ্ধে মন্ত্রণা দিল, তখন তিনি তাহাই বিশ্বাস করিয়া লইলেন, এবং যে-শৈলকে তিনি সব দিক্ দিয়া সর্ব্ব-প্রকারে বিশ্বাস করিতেন, তাহাকেই আবার অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু মজা এই যে, শৈল চলিয়া গেলেও তিনি স্বস্তিবোধ করিতে পারিলেন না। শৈলর জন্য তাঁহার অস্বস্তির মূল কারণ—তিনি বাৎসল্য প্রকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

'পরিণীতা' উপন্যাসে ভুবনেশ্বরীর বাৎসল্য সিদ্ধেশ্বরীর বাৎসল্যের মত নহে। ললিতা ভুবনেশ্বরীর আপন বলিতে কেহ নহে। কিন্তু তিনি তাহাকে কন্যার অধিক স্নেহ-যত্ন করিতেন। ললিতার মা-বাপ ছিল না। এই জন্যই বুঝি ললিতার উপর তাঁহার স্নেহটা কিছু অধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল। ভুবনেশ্বরীর বাৎসল্য ছিল করুণাত্মক। মাতা যেমন ভাবে কন্যাকে দিয়া সংসারের ছোট-ছোট কাজ করাইয়া লন, তাহাকে কাজ শিখান, ভুবনেশ্বরীও সেইরূপ ললিতাকে দিয়া ছোট-ছোট কাজ করাইয়া লইতেন এবং কাজ শিখাইতেন। ভুবনেশ্বরী কোথাও বেড়াইতে গেলে কন্যার মত ললিতাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যান।

ললিতার মঙ্গলামঙ্গলের অনেকখানি চিন্তাই তিনি করেন। বিদেশে থাকিয়া যখন ভুবনেশ্বরী শুনিলেন, গুরুচরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ছাদের যাতায়াতের পথটা মস্ত পাঁচিল দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কিন্তু ললিতার অবস্থাটাই যেন তাঁহাকে অধিক আঘাত দিয়াছিল। "ভুবনেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ললিতা মেয়েটাকে যদি সঙ্গে আনতুম্, তা' হলে যা' হয় একটা উপায় আমাকেই ক'রে দিতে হোতো—দিতামও।"—৮ম পরিচ্ছেদ, পরিণীতা। ইহার পরে ভুবনেশ্বরীর আর বিদেশে থাকিতে ভাল লাগিল না।

'অরক্ষণীয়া' গল্পে যে-ভামিনী দৈহিক সৌন্দর্য্যে 'পোড়াকাঠ', তাহারও অন্তর-তলে বাৎসল্যের উৎস বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার স্বার্থপর হীনমনাঃ স্বামী, গাঁজাখোর নবীনের সহিত জ্ঞানদার বিবাহের চক্রান্ত করিলে, ভামিনী তাহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। জ্ঞানদা জ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহার চিকিৎসার জন্য সে তাহার 'সম্বলের সম্বল একগাছি রূপার গোট' বন্ধক দিয়া ডাক্তার ডাকাইয়া আনিয়াছে। মেয়েদের গহনা-প্রীতি প্রবল, কিন্তু বাৎসল্যের তুলনায় তাহা কত তুচ্ছ!

'মেজদিদি' গল্পে হেমাঙ্গিনীর বাৎসল্য কেষ্টার উপর বর্ষিত হইয়াছে। কেষ্টা তাঁহার আপন বলিতে কেহ নহে, জায়ের বৈমাত্রেয় ভাই। আশ্চর্য্য এই যে, কেষ্টা তাহার বৈমাত্রেয় দিদি কাদম্বিনীর নিকটে স্নেহ-ভালবাসা তো পায় নাই, অধিকন্তু পাইয়াছে ঘৃণা, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন। স্বামী কেষ্টাকে আর দুটি ভাত দিতে বলায় কাদম্বিনী এক থালা ভাত তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'তবেই হয়েছে, এ হাতীর খোরাক নিত্য যোগাতে গেলে যে আমাদের আড়ত খালি হয়ে যাবে। ও-বেলা দোকান থেকে মণ দুই মোটা চাল পাঠিয়ে দিয়ো, নইলে দেউলে হ'তে

হ'বে তা' ব'লে রাখ্‌ছি।"—প্রথম পরিচ্ছেদ। শুধু তাহাই নহে, তিনি আবার কেষ্টাকে দিয়া বাড়ীর ময়লা কাপড়গুলি কাচাইয়া লইতেছেন। প্রথম হইতেই কেষ্টার উপর হেমাঙ্গিনীর স্নেহ জন্মিয়াছিল। এই কেষ্টার জন্যই তিনি স্বামীর নিকট গঞ্জনা পাইয়াছেন, এই কেষ্টাকে স্নেহ করিতে গিয়া, তাহাকে একটু যত্ন করিতে গিয়া ভাসুরের বিরক্তির ভাজন হইয়াছেন, দুই জায়ে মনোমালিন্য হইয়াছে। এই মাতাপিতৃহীন ছেলেটির উপর তাঁহার যে-স্নেহ জন্মিয়াছিল তাহারই বশে তিনি এত দুঃখ-লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারেন নাই। হেমাঙ্গিনী স্বামীকে বলিতেছেন, 'ওকে আমি পেটের ছেলের মত ভালবেসেছি। দাও আমাকে—মানুষ করি—খাওয়াই পরাই—তারপরে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের, তাই ক'রো। বড় হ'লে আমি একটা কথাও ক'ব না।"—৮ম পরিচ্ছেদ। "কেষ্টাকে আশ্রয় দাও, নইলে এ জ্বর আমার সারবে না। দুর্গা আমাকে কিছুতে মাপ করবেন না।" যখন হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, কেষ্টাকে লইয়া এ বাড়ীতে থাকা একান্ত অসম্ভব, তখন তিনি কেষ্টাকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতেছেন। কেষ্টার উপর হেমাঙ্গিনীর যে কমনীয় বাৎসল্য তাহা অত্যাচারীর নির্ম্মম নিষ্ঠুর ক্রূরতার বিরুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ করুণা-ক্লিষ্ট হৃদয়ের কাতর অভিমান।

'মামলার ফল' গল্পে দেখা যায়, দেবর-পুত্র গয়ারামের উপর গঙ্গামণির যে মাতৃস্নেহ পড়িয়াছে তাহাই শেষ কালে বোধ হয় শিবু ও শম্ভু দুই ভাইয়ের মধ্যে কলহের অবসান করিয়াছে। গয়ারাম এক বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়। সেই অবধি সে বরাবর তাহার জেঠাইমার কাছে মানুষ হইয়া আসিয়াছে। জেঠাইমার নিকটে তাহার যত কিছু আদর-আবদার-উপদ্রব। জেঠাইমাও তাহাকে বরাবর আপনার গর্ভজাত সন্তানের

ন্যায় লালন-পালন করিয়াছে, তাহার কৃত সব উপদ্রব-উৎপাত সহ্য করিয়া চলিয়াছে। শিবু ও শম্ভু দুই ভাই পৃথগন্ন হইয়াছে। কিন্তু গয়ারামের প্রতি গঙ্গামণির স্নেহ বিন্দুমাত্র কমে নাই। গয়ারাম যে-দিন চ্যালাকাঠ দিয়া গঙ্গামণিকে আঘাত করিয়াছিল, সে-দিন তাহার রাগটা খুব বেশী হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা তাহার দেবর শম্ভু ও তাহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর উপর। যখন তাহার স্বামী ও ভাই উভয়ে মিলিয়া গয়ারামকে জেলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল তখনই সে তাহার রাগের সীমা বুঝিতে পারিল এবং গয়ারামের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। গয়ারাম জেঠাইমাকে আঘাত করিয়াছিল—মামলাটা আপাততঃ এই কারণেই সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জেঠাইমার যে মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহধারা গয়ারামের উপর পড়িয়াছিল তাহা মুহূর্ত্তের ক্রোধের উত্তেজনায় সমূলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে না। সেই জন্য দেখা যায়, গঙ্গামণি গয়ারামকে বরাবর আপনার স্নেহের আবরণে ঘিরিয়া রাখিবার জন্য একাকী তাহাকে লইয়া নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে কারখানার কুলী-মজুরদের আড্ডায় কাল কাটাইতেছে। গঙ্গামণির রাগটা যেমন স্বাভাবিক, মাতৃস্নেহ ততোধিক অকৃত্রিম।

'বিন্দুর ছেলে' উপন্যাসে দেখা যায়, ভাসুর-পুত্র অমূল্যধনের উপর বিন্দুর বাৎসল্য জন্মিয়াছে। বিন্দুর সন্তান হয় নাই, সেইজন্য একই বাড়ীর একটি মাত্র সন্তানের উপর তাহার স্নেহ জন্মান অস্বাভাবিক নয়, এবং জন্মিয়াছেও। বিন্দু অমূল্যকে লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাহাকে স্নান করান, খাওয়ান, তাহার জামা-কাপড় গুছাইয়া রাখা, তাহাকে পাঠশালায় পাঠান—এই সব ব্যাপার লইয়া বিন্দুর দিন কাটিয়া যায়। সংসারের অন্য কোন দিকে মন দিবার আর তাহার সময় থাকে না। অমূল্যকে বিন্দু আপনার স্নেহচ্ছায়ে এমন ভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে,

অন্নপূর্ণা যে অমূল্যর জননী তাহা বাহিরের কেহ দেখিলে হঠাৎ বুঝিতে পারে না। যাহাতে অমূল্য কোন প্রকারে একটু বিগড়াইয়া না যায়, যাহাতে তাহার লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত হয়, যাহাতে সে ভবিষ্যতে দেশের দশজনের একজন হইয়া উঠে সেই সব দিকে বিন্দুর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বিন্দু অমূল্যকে অকপট স্নেহ করে। কিন্তু অমূল্য অসৎ ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া অসৎ হইয়া যায়, তাহার নৈতিক চরিত্রে কোন প্রকারে আঁচড় লাগে—ইহা তাহার পক্ষে সহনাতীত ব্যাপার। অমূল্যকে মানুষ করিয়া তুলিবার ব্যাপার লইয়া অন্নপূর্ণা ও বিন্দুর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি। মনোমালিন্যের উপলক্ষটা অতি সামান্য। বিন্দু অভিমানিনী। সে সহজে নিজের পরাজয় তো স্বীকার করিতে চায় না। অধিকন্তু অতিরিক্ত স্নেহের আতিশয্যে অমূল্যর ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অন্নপূর্ণার উপর আপনার রাগটা প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। কথায় কথা বাড়িয়া বিন্দুর মুখ হইতে বে-ফাঁস কথা বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতেই অন্নপূর্ণা ও বিন্দুর মধ্যে কলহ ও বিচ্ছেদ ঘটিল। যাহা হউক, অমূল্যর উপর বিন্দুর মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম। এই অকৃত্রিম মাতৃস্নেহই অন্নপূর্ণা ও বিন্দুর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাইতে পারিল। ইহাই প্রেমের যথার্থ পরিচয়। এ ক্ষেত্রে সম্পর্কীয় অপরের সন্তানের প্রতি যে বাৎসল্য তাহাই লক্ষ্যীভূত। আর "প্রেম দিলে তবে প্রেমে পূরে প্রাণ"। সেই জন্য বিন্দু ও অন্নপূর্ণার মধ্যে প্রীতি অটুট রহিল। 'রামের সুমতি' গল্পে দেখা যায়, দেবর রামকে নারায়ণী আপনার একান্ত মাতৃ-হৃদয় দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। রাম অল্প বয়সেই মাতৃহীন হয়। তারপর সে ছিল বড়ই দুর্দ্দান্ত, খানিকটা 'মামলার ফলে'র গয়ারামের মত। মাতৃহীন ছেলেকে শুধু মানুষ করা নয়, তাহার সমস্ত দুর্দ্দান্তপনা ও উপদ্রব সহ্য করিয়া যাওয়া—উভয়ই নারায়ণীর দৈনন্দিন ব্যাপার। নারায়ণী যে কোন দিন দেবর রাম

ও আপন পুত্র গোবিন্দর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই, বরং তিনি গোবিন্দকে যে কোন দিন একটা বিশেষ আদর-আবদার দেখাইয়াছেন তাহাও দেখা যায় না। নারায়ণীর মাতা দিগম্বরী সর্ব্বদা রামের বিরুদ্ধে ঈর্ষাকাতর ভাব লইয়া টিক্-টিক্ করিতেছেন। তিনিই জামাতা শ্যামলালকে বলিয়া কহিয়া রামকে পৃথগন্ন করাইলেন। যে সংসারে দিগম্বরীর মত কুটিল স্বার্থপর স্ত্রীলোক বিরাজমান সেই সংসারে তাঁহারই কন্যা নারায়ণী নিঃস্বার্থ সরল মাতৃ-হৃদয় লইয়া সংসারের শান্তি ও সুখ রক্ষা করিতেছেন। রামের খাওয়া না হইলে নারায়ণী উপবাস করিয়া কাটাইয়া দেন। রামকে পৃথগন্ন করা হইলে নারায়ণী সেই কয় দিন এক প্রকার উপবাসে কাটাইলেন। তারপর রামের স্বহস্তে রান্না করা, না খাইয়া থাকা প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। রাম যখন গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য ভোলাকে দিয়া তাঁহার কাছে দু'টাকা চাহিয়া পাঠাইল তখন নারায়ণী আর থাকিতে পারিলেন না। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কোলে বসাইয়া খাওয়াইয়া সমস্ত বাদ-বিসংবাদের অবসান করিলেন। রামকে পৃথগন্ন করার পর তাহার আহার না হওয়ায় নারায়ণীর করুণাত্মক মাতৃ-হৃদয় যেমন ভাবে খালি হইয়াছিল, গয়ারামের নিকট চ্যালাকাঠের আঘাত খাইয়াও তাহাব জেলে যাওয়ার ভয়ে গঙ্গামণির নারী-হৃদয় তেমনি উদ্বেলিত হইয়াছিল। গয়ারাম ও রামকেই বুকে করিয়া গঙ্গামণির ও নারায়ণীর বুকের জ্বালার অবসান হইয়াছে—এ ক্ষেত্রেও নামের দিক্ দিয়া একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়।

আর একজনের মাতৃমূর্ত্তি চিত্তাকর্ষক—সে হইতেছে 'শ্রীকান্ত'-উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মী তাহার সপত্নী-পুত্র বঙ্কুকে আনিয়া আপনার কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে, মানুষ করিয়াছে, তাহাকে তাহার

দুইখানি বাড়ী উইল করিয়া দিয়াছে। এই মাতৃস্নেহে কপটতা নাই, কিন্তু এই মাতৃহৃদয়ে ব্যর্থতা আছে। জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রণয়ের মূল, মাতৃত্বেই প্রণয়ের পরিণতি। রাজলক্ষ্মী জননী হইতে চায়—"এ লোভ (অর্থাৎ জননী হওয়ার লোভ) আবার কোন্ মেয়ে-মানুষের নাই?"—১৩শ পরিচ্ছেদ, ২য় পর্ব্ব, শ্রীকান্ত। কিন্তু তাহার মধ্যে যে মাতৃত্ব-বোধ জাগরিত হইয়াছে তাহাই তাহার প্রণয়ের পরিণতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীকান্তের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা পাছে অন্যের চক্ষে, বিশেষ ভাবে ছেলে বঙ্কুর চক্ষে পড়িয়া একটা আলোচনা বা সন্দেহের বস্তু হয় সে-দিকে সে সতর্ক। সেই জন্য যখন শ্রীকান্ত বলিল, "কোথাও যাবার ত এখন আমার তাড়া নেই, তাই আরও কিছু দিন থাকৃব ভাব্‌ছি!" তখন পিয়ারী কহিল, "কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজ-কাল বাঁকিপুর থেকে আস্‌ছে। বেশী দিন থাকৃলে সে হয়ত কিছু ভাব্‌তে পারে" শ্রীকান্ত এ কথাটা প্রথমতঃ ভাল বুঝিতে পারে নাই। তারপর বঙ্কুর সহিত আলাপ করিতে করিতে সে বুঝিতে পারিল—রাজলক্ষ্মীর লজ্জা বা সঙ্কোচ করিবার স্থান কোথায়। সে বুঝিতে পারিল, যদিও রাজলক্ষ্মী সর্ব্বপ্রকারেই স্বাধীন, "তবুও সে যে মুহূর্ত্তে এই একটী দরিদ্র সন্তানের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শতপাকে বেড়িয়া লোহার শৃঙ্খল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাহাই হউক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে। তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাহুক, কিন্তু এ কথাও ত সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা! এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোন মতেই অপমানিত করিতে পারে না।" "আজ তাহার চারি পাশে ছেলেমেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই

প্রীতি ও ভক্তির আনন্দ-ধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া ছিনিয়া বাহির করিয়া আনিব—এত বড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন অধ্যায়েই চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।”—১২শ পরিচ্ছেদ, ১ম পর্ব্ব, শ্রীকান্ত। বঙ্কু না থাকিলে বোধ হয় শ্রীকান্তের সহিত জীবনাতিবাহিত করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে অসম্ভব হইত না। কিন্তু সে যে মাতৃত্ব-বোধটুকু পাইয়াছে তাহারই সম্ভ্রম হইতে সে আপনাকে কোন প্রকারে বঞ্চিত করিতে পারে না। সেইজন্য সে শ্রীকান্তকে আপন নিকটতম সান্নিধ্যের মধ্যে পাইয়াও আপনাকে যে কেবল ভোগ-তৃপ্তি হইতে সংযতভাবে দূরে রাখিয়াছে তাহা নহে, এমন কি শ্রীকান্তকেও দূরে সরাইয়া দিয়াছে। আবার সেই শ্রীকান্তের জন্য সে হা-হুতাশ করিয়াছে, চোখের জলে ভাসিয়াছে। ২য় পর্ব্ব, ১৩শ পরিচ্ছেদে যখন শ্রীকান্ত কথায় কথায় বলিল,—ধর, যদি সে (রাজলক্ষ্মীর স্বামী) তোমাকে ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দু'একটি ছেলেপুলে হোতো, একবার ভেবে দেখ দিকি অবস্থাটা ? তখন রাজলক্ষ্মী বলিয়াছিল—“আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক্, বাইউলি হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হোতো।” জননী হওয়ার সার্থকতা তাহাকে ভিক্ষা করিবার পথে ক্ষমতা যোগাইত, ইহার সম্ভ্রম বাইউলি হওয়ার শক্তি হরণ করিয়া লইত। রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্ব জাগরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ণতা লাভের সুযোগ নাই। সেই জন্যই তাহার বাৎসল্য শতভাবে রূপ লইয়া আপনাকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে চাহিতেছে। ইহারই কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া শ্রীকান্ত চিন্তা করিতেছে—“আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্য নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায় ?

তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সে-দিন পাটনায় তাহার যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল, তত বড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বঙ্কুই তাহার কাছে পর্য্যাপ্ত নয়, আজ তুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখদুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে।" এটা মনস্তত্ত্বের শুধুই গভীরতা নহে, বাস্তব জীবনে এই প্রকার দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে দেখা যায়। আর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাহারই নিখুঁত ভাবের হৃদয়াকর্ষক পরিচয়-পত্র সাহিত্যের আসরে যোগাইতেছেন। শরৎচন্দ্র সাধু! সম্ভ্রমবোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রাজলক্ষ্মী আর এক বার শ্রীকান্তকে বলিয়াছিল, "কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে ঘুরে মর্‌চি—" "ছেলেই বা কি ভাব্‌চে, চাকর-বাকরেরাই বা কি মনে কর্‌চে! ছি ছি, এ যেন একটা হাসির ব্যাপাব ক'রে তুলেছি।" আর এই কারণেই শ্রীকান্তের যে অবিচলিত ভাব তাহা সত্য, এবং ইহারই আওতায়, যদিও রাজলক্ষ্মীর তুর্ব্বশ হৃদয় শ্রীকান্তকেই পাইবার জন্যই প্রচণ্ড শক্তিতে টানাটানি করিয়াছে, তবুও তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইয়াছিল। আর এই কারণেই শ্রীকান্ত হৃদয়ের আকর্ষণে যে কমললতাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহারও অকালে গর্ভনাশরূপ নিষ্ঠুর ক্রিয়ার জন্য বঞ্চিত মাতৃ-হৃদয় ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়াছে, "একখানি অমৃত-বস্তুর জগতে কি সত্যই প্রয়োজন ছিল না? মানব-সমাজে মানব-শিশুর মর্য্যাদা নাই,

নিমন্ত্রণ নাই, স্থান নাই বলিয়া ইহাকেই ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে হইবে? কল্যাণের ধনকেই চির-অকল্যাণের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের বৃহত্তর ধর্ম্ম আর নাই!" কমললতার মাতৃ-হৃদয় সত্যই লাঞ্ছিত, সেইজন্য সে বলিতেছে, "নিজের আয়ুষ্কালটাকে নিজের হাত দিয়া প্রতিনিয়ত হত্যা করিয়া চলা ব্যতীত সংসারে আর যেন আমার কিছু করিবার নাই।"

প্রেমে নারী

এ বিশ্বে যাহা কিছু প্রকাশমান এবং লীলায়মান, এ ধরণীর বুকে যত কিছু বিচিত্র এবং আনন্দদায়ক সকলেরই উৎস প্রেম। সত্যই জড় জগতে যাহা আকর্ষণ জীব-জগতে তাহাই প্রেম। যে-আনন্দ-মদিরা-ধারায় মানুষ বাল্যে ক্রীড়াসক্ত, কৈশোরে মুগ্ধ, যৌবনে উন্মত্ত এবং বার্দ্ধক্যে মগ্ন, যাহার প্রেরণায় সৃষ্টি রক্ষা হয়, জীবন প্রসার লাভ করে, যাহার তুচ্ছতর কালিমা কামো""দনা, যাহাকে ছোট করিয়া দেখিলে কামনা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না—যাহার প্রয়োজন নিত্য—তাহাই প্রেম। যেখানে দৃষ্টির প্রসার নাই, সেখানে চারিদিকে বিশেষ সংকীর্ণ গণ্ডীরেখা টানা হয়—হয়ত তাহা সম্পূর্ণ ছোট্ট স্বয়ংটিকে কেন্দ্র করিয়া, নয়ত তার ক্ষুদ্র পরিবারটিকে ঘিরিয়া, হয়ত সেখানে সদিচ্ছার কোন প্রয়োজন রাখা হয় নাই, নয়ত যতটুকু রাখা হইয়াছে তার পঙ্কিলতা খুব বেশী, কারণ, হয়ত সেখানে সংযম রক্ষা হয় নাই, নয়ত সেখানকার সৎবুদ্ধি ব্যাপকতর নয়, হয়ত সেখানে অপরের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিবেচনা নাই, অসহায়দিগের জন্য দায়িত্ব-বোধ নাই। তাহা হইলেও ইহা প্রেম ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ইহাও যেমন সত্য, তেমনি প্রেম যে সমাজের বিধি-নিষেধ, শাস্ত্রের অনুশাসন, জ্যেষ্ঠদের স্বার্থ, অধিকার বা খেয়াল, চারিদিকের স্বচ্ছন্দ ও অনুকূল বায়ুরূপ 'চিড়ার বাইশ ফের' বজায় করিয়া চলিতে পারে না ইহাও সত্য। সেইজন্য ভালবাসার বাস্তব পদার্থ যাহারা তাহাদের অধিকাংশেরই লীলাক্ষেত্র অন্তর রাজ্যে—যে রাজ্যে প্রাণবস্তু সিঞ্চিত হয় বিরহে, যেখানে প্রেমের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়

ত্যাগে। প্রেমের আসল পবিত্র রূপ নষ্ট হয় জীবনযাত্রার দৈনন্দিন স্বার্থ ও সংকীর্ণতার সংঘর্ষে। ভালবাসা যদি প্রবাহই হয় তাহা হইলে মিলনে সে প্রবাহ ক্ষুব্ধ হয়, বিরহে বিচ্ছেদে বা অমিলনাত্মক ছন্দেই যেন তাহার ছন্দময়তার গীতি আমাদের প্রাণস্পর্শ করিয়া ছন্দোবদ্ধেই ধ্বনিত হয়। এখন বলা যাইতে পারে যে, ভালবাসা-রাজ্যের প্রাণবস্তু সংযম, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও বিরহ, এবং সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী নারী ; কারণ প্রকৃতি নারীর মধ্যেই মাতৃত্বের সহজ এবং স্বাভাবিক নিষ্ঠা ও ত্যাগ অকাতরে বিলাইয়া দিয়াছেন। এই সহজসাধ্য নিষ্ঠা ও ত্যাগের সহিত সংযমের কখনই বিরোধ ঘটিতে পারে না। আর যে মাতৃহৃদয়া নারী জঠর হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়াই ব্যথা-কাতর প্রাণে বিচ্ছেদের জন্যই সন্তানের সুখের দিকে চাহিয়া মৌনস্তব্ধতাকে ব্যথার নিগূঢ় রসে উপভোগ করিতে পারে, সেই মহীয়সী নারীর পক্ষেই এই বিরহ-বেদনা উপভোগ করা কত না মধুর! সেইজন্য অশ্রুমতী নারী কতই না সুন্দর! নিম্ন পর্য্যায়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কামই যে সৃষ্টি ও জীবতত্ত্বের প্রতীক তাহাতে সন্দেহ নাই। কামনার প্রধান ভাগে ইহারই জন্য রূপ-রস-আদি উপকরণের কতই না প্রয়োজন। ইহাতেই মূলতঃ জীবন বর্দ্ধন এবং বর্দ্ধমান জীবনের পরিচর্য্যা ও ভরণ-পোষণ হয়। সমষ্টির সুখ এবং তাহার মাত্রা ও উৎকর্ষ যাহাতে লাভ হইবে তাহারই ক্রমিক প্রবাহ এই প্রেম। সেই জন্য প্রেমেই মানসিক বৃত্তির অধিক বিকাশ লাভ ঘটে। আমরা নারী-শীর্ষক অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, বিকাশের মূল প্রকৃতি, নারীতেই তাহার সম্যক্ পরিণতি। প্রেমে-নারী দেখিতে গিয়া নারীতেই প্রেমের সম্ভাব্য শক্তির সম্যক্ পরিচয় পাই। প্রকৃতি নারীতেই প্রেমের পট ধরিয়া তাহারই আশায় সকলকে নাচাইতেছে, খাটাইতেছে, জীবন বর্দ্ধনের প্রয়াস পাইতেছে। এই জন্য, 'নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব'-শীর্ষক

অধ্যায়ে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি—শরৎচন্দ্র ইহার জন্য দায়ী নহেন। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সকলেই এবং প্রকৃতির লীলায়মান এই ভূয়ঃ সৃষ্টি আদি, বিকাশ ও পরিণতিতে প্রেমকে মূলীভূত করিবে এবং প্রেমের বিকাশ নারীতেই পূর্ণ করিয়া তুলিবে। দেহঘর আমাদের ক্ষণভঙ্গুর, মন প্রাণ মায় জ্ঞানবুদ্ধি সকলই দিনের হাল্কা হাওয়া বা অদিনের ঘূর্ণীবায়ু, ঝড় ও ঝাপ্‌টা—যার উপর নির্ভর করিয়া ঘর করা চলে না। কিন্তু সকলকে বাঁচাইবার জন্য, এমন কি, প্রলয়ের হাত হইতেও রক্ষা করিবার জন্য যে প্রেম-বারি সঞ্চিত থাকে—সকলের মধ্যে সেই-ই তো আত্মিক বল—সত্য শক্তি। রাসায়নিক ইহাকে affinity বা আকর্ষণ-শক্তি, পদার্থবিদ্‌ ইহাকে potentiality বা সম্ভাব্য-শক্তি বলেন। জীবতত্ত্ববিদ্‌ যৌনশক্তির আকারে মনস্তত্ত্বে ইহারই সন্ধান libido বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কবি ও দার্শনিক সত্যে ও আনন্দে 'truth is beauty' বলিয়া ইহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। আর ঔপন্যাসিক নর-নারীর প্রেম-প্রবাহে ইহারই ফলাও বর্ণনা করেন। কিন্তু সুন্দরের সৌন্দর্য্য যেমন গোলাপেই ফুটে, আমাদের চোখে ঘেঁটু ফুলে ফুটে না, (হয়ত প্রজ্ঞদিগের কাছে একটি তৃণও সেই সুন্দরের বার্ত্তা ছাড়া আর কিছু জানায় না) তেমনই নারীতে যেন ব্যক্তের মধ্য দিয়া প্রাণের কোমলতা, তাহাতেই যেন যৌবনের ও লাবণ্যের খেলা। তাহারই মধ্যে যতখানি পূর্ণতা ততখানি নিঃশেষে আত্মদানের ফলে অপূর্ণতা; তাই নারীর প্রেমে এত প্রবাহ এবং সেই সঙ্গমে এত পবিত্রতা! প্রবাহ যেখানে গভীর, আবিলতার স্থান সেখানে কম। সেইজন্য কমললতার কথায় বলা চলে, মেয়েরা সত্যই চায় গভীরতা, কারণ তাহারা চায় শান্তি। কিন্তু নারী-প্রেমের প্রবাহ কখনও ঋজুগতিতে বহে না।[১]

এখন আমরা শরৎ-সাহিত্যে নারীর প্রেম আলোচনা করিতে গিয়া মোটামুটি দুই দিক্ ধরিয়া অগ্রসর হইতে পারি। প্রথমতঃ—কুমারীর বা বিধবার উদ্দাম ও উদ্বেলিত হৃদয়ের অমিলনাত্মক প্রেম, হয়ত তাহা সংযত ও শান্ত, নয়ত অসংযত ও অবৈধ, দ্বিতীয়তঃ—মিলনাত্মক ও চিরাচরিত স্নিগ্ধ-প্রেম। কুমারীর প্রেম শুধু সাহিত্যে নহে, বাস্তব জীবনে সমাজক্ষেত্রেও ঘটিতে দেখা যায়। আর ইহা শুধু শরৎ-সাহিত্যে নহে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম সাহিত্যে পর্য্যন্ত ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়।

শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের রচনা 'দেবদাসে'র মধ্যে দেখা যায়, পাঠশালায় দেবদাসের প্রতি পার্ব্বতীর আসক্তি জন্মিয়াছিল। পাঠশালায় জ্ঞান সঞ্চার না হইয়া হইল কিনা প্রেমের উদয়। স্বতঃস্ফূর্ত্ত সিঞ্চিত প্রেম যখন যাহাকে যেখানে যেমন ভাবে আশ্রয় করিবার সুবিধা পায়, তখন তাহাকে সেইখানে তেমন ভাবে পাইবার জন্য মুক্তধারে প্রবাহিত হয়। দোষ আর কাহারও নহে, দোষ প্রকৃতির। শান্তরসাস্পদ তপোবন, পবিত্র দেবমন্দির প্রভৃতির মত স্থানে প্রণয়-সঞ্চারের কাহিনীর অভাব নাই, নজির-স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায়—মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের প্রণয়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' উপন্যাসে দেবমন্দিরে তিলোত্তমার প্রণয়, রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গ-বিজেতা' উপন্যাসে বিমলার প্রণয়। পাঠশালায় প্রেম-সঞ্চারের কাহিনী শুধু এইটি একক নহে। 'পল্লী সমাজে' রমা ও রমেশের প্রণয় পাঠশালায় সুরু হইয়াছিল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রণয়ের প্রথম স্থান পাঠশালা। যাহা হউক, পাঠশালায় দেবদাসের প্রতি পার্ব্বতীর যে

(১) 'The course of true love did never run smooth'.
—Shakespeare.

প্রণয় জন্মিয়াছিল তাহাকেই সে শেষ পর্য্যন্ত আপনার হৃদয়ের তলে তলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। পাঠশালা হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে পার্ব্বতী যখন শুনিল, দেবদাস আর পাঠশালায় আসিবে না, তখন কথাটা তাহার আদৌ ভাল লাগে নাই। আর একদিন পার্ব্বতী দেবদাসের আদেশমত বাঁশের ডগা ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া বা অন্যমনস্ক হইয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহাতে সে দেবদাসের নিকট প্রহার খাইয়াছে; কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া দেবদাসের কৃত কাজের কথা বলিলে পাছে দেবদাস তাহার পিতার কাছে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হয় এই আশঙ্কায় তাহার দণ্ডদাতা এবং হৃদয়দেবতা দেবদাসকেই বাঁচাইবার জন্য সে তাহার পিতামহীর নিকট বলিয়াছে—তাহাকে পণ্ডিত মহাশয় বেত্রাঘাত করিয়াছেন। একদিন দেবদাসের সহিত বাঁধে মাছ ধরিতে গিয়াছিল বলিয়া সে তাহার মায়ের নিকটে উত্তম-মধ্যম দু' ঘা খাইয়াছে। রাত্রিটুকু মাত্র কাটিয়াছে, পরদিন আবার সে দেবদাসের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। এই যে যুগ্ম-হৃদয়ের আকর্ষণ—শাসন যেখানে বাধা দিতে পারে না—ইহাকে কি ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে? শৈশবের এই সমস্ত প্রণয়-খেলা কৈশোর ও যৌবনের প্রেমলীলারই সূচনা। দেবদাস যখন প্রথম কলিকাতা রওনা হইল, "তখন পার্ব্বতীর কত কষ্ট হইল, কত চোখের জলের ধারা গাল বাহিয়া নীচে পড়িতে লাগিল; কত অভিমানে তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। ......ইতিপূর্ব্বে পাঠশালা ছাড়িয়া অবধি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু গোলমাল, হুজুগে কাটিয়া যাইত, কত কি যেন করিবার আছে, শুধু সময়ে কুলাইয়া উঠে না। এখন অনেক সময়, কিন্তু এতটুকু কাজ খুঁজিয়া পায় না।"

দেবদাস কলিকাতা চলিয়া গেলেও পার্ব্বতী তাহার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই ভুলে নাই। তাহার ধারণা ছিল, দেবদাসের

উপর তাহার একটা অধিকার আছে। দেবদাসের বেত্রাঘাতই এই আধিপত্য স্বীকার করিয়া যায়। "অজ্ঞাতসারে, অশান্ত মন দিনে-দিনে এই অধিকারটি এমন নিঃশব্দে অথচ এতই দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল, যে, বাহিরে যদিও একটা বাহ্য প্রকৃতি তাহার এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আজ (যে-দিন দেবদাসের সহিত তাহার বিবাহের আর সম্ভাবনা রহিল না) এই হারাণোর কথা উঠিতেই তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল।" "বিবাহ হইতে পারে না—এই সংবাদটা পার্ব্বতীর হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল।" পার্ব্বতী যেমন দেবদাসকে আপনার হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়াছিল তেমনি সে তাহাকে বাহিরে পাইবার জন্যও তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল। এমন কি, কলঙ্কের আশঙ্কাও তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই। সে গভীর রাত্রিকালে অভিসারিকার রূপে দেবদাসের নিকটে চলিয়াছে এবং তাহাকে পায়ে রাখিবার জন্য দেবদাসকে সাধিতেছে। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল তাহার সমস্ত কলঙ্কের কালিমা দেবদাস ঢাকিয়া দিবে, কিম্বা কলঙ্কই সে মাথার মুকুট করিয়া রাখিবে। কথায় কথায় যখন দেবদাস বলিল, "পারু। বাপ-মায়ের অবাধ্য হ'ব?" পারু বলিল, 'দোষ কি? হও।' পার্ব্বতীর প্রণয় বংশগৌরবকে একটা মিথ্যা সম্মান দিয়া দেখিতে বা দেখাইতে চায় না, সংস্কার মানিতে চায় না, মাতা-পিতার অপেক্ষা রাখে না, সে শুধু তাহার প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইয়া আপনার নারী-জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চায়। চিরকাল-প্রচলিত-সংস্কারাচ্ছন্ন ও সত্য-সংস্কার-বিরোধী মন এই ব্যাপারে সায় দিবে না। দেবদাস পার্ব্বতীর কথায় স্বীকৃত হয় নাই, সেই সময় বোধ করি পার্ব্বতীর মন এই ভাবিয়া দেবদাসের উপর

বিরক্ত হইয়াছিল যে, আমি নারী হইয়া যে-সংস্কারকে আবর্জ্জনার মত দূর করিয়া ফেলিতে পারি, যে-সাহসের কাজ করিতে পারি, দেবদাস পুরুষ হইয়া সেই সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে না, সেই শক্তির কাজ করিতে পারে না। সে বোধ হয় আরও বুঝিয়াছিল—সহরের আলোক-প্রাপ্ত ধনী বিলাসী দেবদাসের হৃদয়ে তাহার মত গ্রাম্য নির্ধন মেয়ের স্থান সংকীর্ণ। অভিমানও যে তাহার মধ্যে আসিয়া না জুটিয়াছিল এমনও নয়। এই জন্যই বোধ হয় দেবদাস আসিয়া নিজেই তাহার মিনতিপূর্ণ আবেদন জানাইলে সে সতেজে ও সাভিমানে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু হৃদয়ের যে-স্থানে সে দেবদাসকে বসাইয়া রাখিয়াছিল, সে-স্থান হইতে সে তাহাকে এক তিলও নড়ায় নাই। দেবদাস ছিপের বাড়ী মারিয়া তাহার কপাল ক্ষত করিয়া দিলেও পার্ব্বতী সে কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করে নাই—ইহাতেই তাহার কামনামুক্ত প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সে বলিয়াছিল, "ঘাটে পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়েছিলুম, ইটে মাথা লেগে কেটে গেছে।" অন্য এক পাত্রের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহ হইয়া গেল। দেবদাসের পিতার মৃত্যুর পর একদিন পার্ব্বতী পিত্রালয়ে আসিয়া দেবদাসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। কথায় কথায় পার্ব্বতী বলিয়াছিল, "ঐ দাগই (অর্থাৎ দেবদাসকৃত পার্ব্বতীর কপালের দাগই) আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল। তুমি আমাকে ভালবাসিতে, তাই দয়া করে, আমাদের বাল্য-ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েছ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী।" পার্ব্বতীর বিবাহ হইয়া গেলেও সে তাহার প্রেমাস্পদমগ্ন মনের কাছে সংস্কারাপন্ন মনের মত বিবাহিত স্বামীকেও অন্তর-স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তখনও দেবদাসের আসন তাহার হৃদয়ে অবিচলিত ছিল। সুকুমারী পার্ব্বতী যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছে

তাহাকেই সে আজীবন আপনার অন্তর-দেবতা জ্ঞান করিয়া, হৃদয়ের নায়ককে সংগোপনে রাখিয়া, বিবাহিত জীবন লাভ করিয়াও প্রথা, কুল, মান, অভিমান, পরিচয়, আত্মবল ও আত্মীয়দিগের স্বার্থ অটুট রাখিয়া চলিয়াছে। প্রেমের নিদর্শনই এই। পার্ব্বতী-চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, সে দেবদাসকে অন্তরের সহিত ভালবাসিলেও বিবাহিত স্বামীর কাছে বা শ্বশুর-বাড়ীতে এই ভালবাসার বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ হইতে দেয় নাই। সে এই ব্যথাক্ষুব্ধ, অফুরন্ত ভালবাসাকে—অসংজ্ঞাত অতৃপ্তিকে ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়া জিয়াইয়া রাখিয়াছে। সে শ্বশুর-বাড়ীতে স্বামী, সপত্নীর পুত্র-কন্যা, অতিথি-অভ্যাগত লইয়া এমনভাবে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছে, যে, তাহার মনকে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র ফাঁক নাই। বঞ্চিত হৃদয় এম্‌নি করিয়াই আপনার আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তির অভাবে সকলের মাঝেই তৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু আপনার জন না পাইয়া স্রোতস্বিনীর মত দুকূল প্লাবিত করিয়া সে অবাধে তাহার পাথেয় অর্থাৎ প্রেম বিলাইয়া চলে। বিবাহিত স্বামীর গৃহে পার্ব্বতী আপনাকে এম্‌নি করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও যখন সখী মনোরমার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, তখন সে দেবদাসের উল্লেখে বলিয়াছিল—"(দেবদাসকে) সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলাম। এখানে ত আপনার লোক কেহ নাই।" কথায় কথায় বলিয়াছিল—"লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিষ নিজে নিয়ে যাব—তাতে লজ্জা কি?" দেবদাস—উচ্ছৃঙ্খল দেবদাস মরিল। যে-দিন দেবদাস মরিল—সেদিন প্রথমটা পার্ব্বতী জানিতে পারে নাই। পার্ব্বতী যখন জানিল—যে-লোকটি গাছের তলায় মরিয়াছে, যাহাকে ডোমে লইয়া গিয়াছে সে তাহারই দেবদাস, তখন যে সমস্ত লজ্জা-সম্ভ্রমের মায়া কাটাইয়া আশঙ্কা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দেবদাসের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিল।

পার্ব্বতীর ব্যবহার সমাজের বিধি-ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করে নাই। পার্ব্বতী তাহার বাসনা মনের কোণে গোপন রাখিয়া সমাজের সহিত সমানভাবে তাল রাখিয়া চলিয়াছে বলিয়া সমাজ তাহার মনের কথা টেরও পায় নাই। সেবাপরায়ণা যেখানে ত্যাগে এবং কামনা যেখানে পরকীয় তৃপ্তিতে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, সমাজ সেখানে সমষ্টির স্বার্থলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া ব্যষ্টির জন্য পুণ্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ তাহার ইহজীবনের মনের একনিষ্ঠতার জয়মাল্যের খোঁজ পায় না। যেখানে অপরিণত যৌবন এতখানি সেই পার্ব্বতী সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করে নাই বলিয়া সমাজের মধ্যে একটা বিদ্রোহের মার মার ধ্বনিও চারিদিক হইতে উত্থিত হয় নাই। তবে মনে মনে যাহাকে স্বামীত্বে বরণ করা যায় সে-ই প্রকৃত স্বামী—এই কথাই শরৎচন্দ্রের মুখ্যতঃ বলিবার বিষয়; জানি না, সনাতন-পন্থীর দল এই কথা শুনিয়া কি ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত সত্য। এই কথাই শরৎচন্দ্র আরও কয়েকখানি পুস্তকে বলিয়াছেন। পরে তাহাদের আলোচনা করা যাইতেছে। শরৎচন্দ্র এখানে উচ্ছৃঙ্খলতা আমদানী করেন নাই। এই পুস্তক রচনার সময় তাঁহার মন সংস্কার-মুক্তই ছিল, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিবার মত তাঁহার যথেষ্ট সাহসের অভাব ছিল। তারপর যখন ক্রমে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা-লাভ হইতে লাগিল তখন তিনি আপনার উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করিবার চেষ্টায় ইচ্ছা করিয়াই লেখনীর সংযম আর বজায় রাখিলেন না। তাঁহার ইচ্ছাকৃত অসংযমের চতুর ক্রমবিকাশের একটা ধারা আছে, তাহা যদিও একটানা নহে—বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহা পাল্লায় মাপা (balanced) অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতার পাল্লা ভারী হইলেই তিনি শৃঙ্খলা ও সংযমের পাল্লায় ঝোঁক দিয়াছেন। একটু তলাইয়া দেখিলে এই বিচ্ছিন্ন ধারার সম্বন্ধ-সূত্র বাহির করিতে বিলম্ব হয় না। আমরা যথাস্থানে

ইহার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব। যাহা হউক, শরৎচন্দ্র চতুর, তবে দরদী। সেই জন্য তিনি পার্ব্বতীর অবস্থাকে আর না বাড়াইয়া অর্থাৎ পাঠকের দৃষ্টি সে-দিকে টানিবার চেষ্টা না করিয়া দেবদাসের করুণ পরিণামের বাহিরের দিক্‌টাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে বলিয়াছেন। "তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদের মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। আর যাহাই হউক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহ-কর-স্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে, যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পায়।" দেবদাসের পরিণাম সত্যই করুণ!

'স্বামী'-উপন্যাসে দেখা যায়, কুমারী সৌদামিনী নরেনকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে গভীরতা ছিল না। সৌদামিনী একদিন নরেনকে ভালবাসিয়াছিল বটে, 'নরেন ব্যতীত যদি আর কাহারও সহিত আমার বিবাহ হয় তবে সেইদিনই যেন আমার মরণ ঘটে'। কিন্তু বিবাহের দিনে নরেন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত বিবাহে তাহার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। অন্য পাঁচজন বাঙ্গালী মেয়ের মত সেও শ্বশুর-বাড়ী গেল এবং ঘর-সংসার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে তাহার স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া শাশুড়ীর সহিত সে কথাকাটিও করিল। ইহার মধ্যে তাহার হৃদয়ে যে নরেনের জন্য কোন স্থান আছে, তাহার পরিচয় নাই। নরেন একদিন শীকার করিবার ছলে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতোমধ্যে সৌদামিনীর মনটা, শাশুড়ীর আড়ি পাতিয়া

তাহার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করা, তাহার বাপের বাড়ী পুড়িয়া গেলে স্বামীর সে সংবাদ গোপন রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে বিতৃষ্ণায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই কারণগুলাই, যে-নরেনকে সে হৃদয়ের দেবতা করিয়া রাখে নাই তাহারই সহিত, তাহার পলাইয়া যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নহে। শরৎ-প্রতিভার সৃষ্টি-নৈপুণ্য এখানে ফুটিয়া উঠে নাই বরং হীন হইয়াছে। সৌদামিনী নরেনের সহিত পলাইয়া গেলেও সে স্বস্তি-বোধ করিল না। সে তাহার স্বামীর নিকটে ফিরিয়া আসিতে চাহিল এবং পরে ফিরিয়াও আসিল। স্বামীকে ছাড়িয়া গিয়া সৌদামিনী যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহারই কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া সে বলিতেছে, "সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের মধ্য দিয়েই পেয়েছিলুম। তবে, কেন তাতে আমার মন উঠ্‌ল না? তাই, যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্যেও তা একদিনের জন্যেও কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতেই হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে এক বিন্দু রেহাই দিলেন না, কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় ক'রে যখন আমাকে পথে বার ক'রে দিলেন—লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না—তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্ব্বনাশী, এ তুই করেছিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোর পেতেই হবে।" সৌদামিনী নরেনকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতে পারে নাই, অথচ স্বামীকেও স্বামী বলিয়া ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই জন্যই স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতেও তাহার কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় নাই। স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে বুঝিতে পারিল, সে কি বস্তু হারাইয়াছে। এটা যেন অনেকটা সংস্কারের মতই

তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 'স্বামী'-রচনার পূর্ব্বে সংস্কারের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র সাধারণের যে সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন তাহাই বজায় রাখিবার জন্য এটা একটা যেন ঘুষ দেওয়া রকমের চেষ্টা বলিয়া মনে হয়।

'পরিণীতা'য় বহুদিন একসঙ্গে মিলামিশা-হেতু ললিতা ও শেখরের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল। বহুদিন একসঙ্গে মিলামিশা-হেতু প্রণয় জন্মিয়াছে—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দেবদাস ও পার্ব্বতীর মধ্যে প্রণয় যদিও পাঠশালায় জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেও ত ঐ একসঙ্গে মিলামিশা-হেতু। এই ভালবাসার বন্ধন ললিতা ও শেখরের মধ্যে ধীরে ধীরে এমনভাবে দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা ছিন্ন করা উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর। ললিতা শেখরের হুকুম ব্যতীত কোথায়ও যাইতে পারিত না। কেহ তাহাকে একথা বলিয়া দেয় নাই, কিম্বা কেন, কি জন্য—এসব তর্কও কোন দিন তাহার মনে উঠে নাই। কিন্তু জীবমাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল; অপরে যা-ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে খুসী যাইতে পারে, কিন্তু সে পারে না। সে স্বাধীনও নয় এবং মামা-মামীর অনুমতিও তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে-কাজ করিতে গেলে শেখরের অসন্তোষ জন্মে এমন কাজ ললিতা করিতে পারে না। যে-দিন থিয়েটার দেখিবার অনুমতি লইতে আসিয়া জানিল, সে চারুর মামার সহিত মিলামিশা করায় শেখর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, সে-দিন যে সে কেবল থিয়েটারে যায় নাই, তাহা নহে, শেখরের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া সে মনের মধ্যে খুব বেদনা পাইয়াছে। শেখর তাহার আপনার জন, সে তাহাকে অসন্তুষ্ট করিয়া আপনি শান্তি পাইবে কেন? কিন্তু সে থিয়েটার দেখিতে না যাওয়া সত্ত্বেও শেখর তাহাকে পরোক্ষভাবে মৃদু তিরস্কার করিয়াছে।

ইহাতে শেখরের উপর ললিতার অভিমান জন্মিয়াছে এবং সেই জন্যই সে চার পাঁচ দিন শেখরকে দেখা দেয় নাই। আপনার লোকের উপরই অভিমান সাজে।

ললিতা ও শেখরের ভালবাসাকে একেবারে পাকা ও দৃঢ় করিবার জন্য শরৎচন্দ্র গান্ধর্ব্ব-বিবাহানুযায়ী মাল্য-বিনিময়ের সাহায্যে পরিণয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। এই ব্যবস্থাটা সুসঙ্গত হয় নাই, ইহা অন্তরের সত্য আকর্ষণকে বাহিরের একটা তুচ্ছ বন্ধন দিয়া আটকাইয়া রাখিবার লোক-দেখান প্রয়াস মাত্র। যদিও ললিতা নিজের বিবাহের কথা শুনিয়াছিল এবং বিবাহ হইয়া গেলে তাহাকে যে শেখরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে—একথা বুঝিতে তাহার বাকী ছিল না, তবুও নিজেকে শেখরের হাতে এভাবে তুলিয়া দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয় নাই। তবে মনের কোণে সে যে-বাসনা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল তাহাই আজ অকস্মাৎ মাল্য বিনিময়ের নামে বিকাশ হইয়া পড়িল—শরৎচন্দ্র এই ভাবে যদি ব্যাপারটাকে সমর্থন করিতে চান তবে আর কিছু বলা যায় না। তবে জবানী-স্বরূপ তিনি শেখরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"আমি অনেক দিন থেকেই ভাব্‌ছি, কিন্তু স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। আজ স্থির করেছি, কেন না, আজই ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।" "আজ-কাল বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছিলে, ললিতা। আমি বিদেশ যাবার আগে সেইটেই বন্ধ ক'রে দিলুম।"—৭ম পরিচ্ছেদ।

ললিতা শেখরের অনুমতি ব্যতীত কিছু করিতে পারে না। তাহার মামা তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া, সে শেখরের সহিত সাক্ষাৎ হইতেই তাহার নিকট এ বিষয়ে উপদেশ চাহিতেছে। তাহার মামার অপেক্ষা শেখরের অধিকারই যে তাহার

উপর অধিক একথা সে শেখরকে ভাল ভাবে জানাইয়া দিয়াছে। "বিক্রী কর্‌বার অধিকার তাঁর নাই, এ অধিকার (অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে তাহাকে অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়ার অধিকার) শুধু তোমারি। তুমি ইচ্ছে কর্‌লে টাকা দেবার ভয়ে আমাকে বিক্রী ক'রে ফেল্‌তে পার বটে।"—৮ম পরিচ্ছেদ। একদিন পার্ব্বতীও ঠিক এম্‌নি ভাবে দেবদাসের পায়ে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। শেখরের মুখ হইতে স্বীকৃতির কোন ইঙ্গিত না পাইয়া ললিতা আপনার অন্তরে আপনি পুড়িয়া যাইতেছে। সে কাহারও নিকট আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না। পার্ব্বতীর তবু মনোরমা বলিয়া একজন সখী ছিল। কিন্তু ললিতার সে রকম কেহ নাই। তাহার অন্তরের কথা মনে করিলে সত্যই বেদনা বোধ হয়। যাহারা ব্যথাকাতর হইলেও কথা-চতুর হইতে পারে না,—ললিতা সেই বিশিষ্ট-সম্প্রদায়ভুক্ত নারীর জাত। তাহার অন্তরে শেখরের জন্য যে স্থান আছে সে স্থানের ভাগ বা অধিকার সে কাহাকেও দেয় নাই। গিরীনের সহিত তাহার বিবাহ হইবে—এই রকমই প্রায় স্থির ছিল। সেই জন্য শেখর গুরুচরণের অসুখের সময় দেখিতে আসিলে ললিতা তাহার সহিত কথা কহে নাই—পাছে কোন প্রকারে আর একজনের সম্মুখে শেখরের সহিত সম্বন্ধটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অথচ আড়ালে শেখরনাথের সহিত দেখা হইলে সে তাহার সহিত কথা কহিয়াছে। গুরুচরণের মৃত্যুর পর যখন গিরীনের সহিত তাহার বিবাহের কথা উঠে তখন সে গিরীনকে আপনার অন্তরের কথা জানাইয়াছে, কিন্তু শেখরের নাম প্রকাশ করে নাই। শেখরের সহিত মিলিত হইতে না পারিলে সে অন্য কাহাকেও লইয়া ঘর করিতে চায় না। বরং সে চিরজীবনের জন্য সামাজিক মতে অবিবাহিত থাকিতে পারে। পার্ব্বতী দেবদাসের সহিত মিলিত হইতে না পারিলেও বাহ্যতঃ সামাজিক

বিবাহে আপত্তি করে নাই। তাহার অন্তরের বাসনাকে গোপনে রাখিয়া সে বাহিরে স্বামীসেবা, লোকসেবা প্রভৃতির মধ্য দিয়া একরকম করিয়া আপনাকে মানাইয়া লইয়াছিল। মানব প্রকৃতির অবস্থাই এই রকম—সে তাহার মনের তৃপ্তি ভিতরের দিক্ হইতে না পাইয়া পরকীয় ভাবে বাহিরে দেশসেবা, ধর্ম্মাচার প্রভৃতির মধ্যে নিয়োজিত থাকিয়া কোন রকমে আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়, নয়, স্বকীয় অতৃপ্তি সজ্ঞানে মানিয়া লইতে চেষ্টা করে। ললিতা শেষোক্ত রকমের। সে শেখরেরই, আর কাহারও নহে। শেখরই তাহার হৃদয়ের দেবতা। তাহাকেই অন্তরে পূজা করিয়া, এমন কি, বাহিরে অপরকে স্থান দিয়া একটা নিছক মিথ্যা অভিনয় করিয়া সে আপনার জীবন কাটাইয়া দিতে প্রস্তুত নয়। ললিতা সংযত, নীরব, শান্ত ও গম্ভীর। সে পার্ব্বতীর মত সুচতুর এবং ছলনাজীবনে সুনিপুণ নহে। তবে এ ছলনা অচলার ছলনা নয়। 'দত্তা'য় আনন্দের যে নিবিড়তা আছে 'পরিণীতা'য় কিন্তু সে রকম কিছু পাওয়া যায় না।

'দত্তা'য় বিজয়ার প্রণয় কুমারীর যুবতী অবস্থার প্রণয়। বিজয়া শিক্ষিতা। কিছুদিনের মিলামিশায় শিক্ষিত যুবক বিলাসের প্রতি তাহার টান পড়িয়াছিল। কিন্তু সহর হইতে গ্রামে আসিবার পর হইতে মুমূর্ষু পিতার আদেশটাই বিজয়ার বেশী করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। ইতোমধ্যে নরেন্দ্রনাথকে গৃহহীন করিবার জন্য কুটিল রাসবিহারীর চক্রান্ত ও বিলাসের দুর্ব্যবহার তাহার মনকে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। আবার বিলাস ব্রাহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, বিজয়া যেন দিনে দিনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে সে নরেন্দ্রনাথের খবর জানিবার জন্য উৎসুক হইল এবং খবরটা জানিতে পারিল। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাহার আলাপও হইল। নরেন্দ্রনাথের

দুঃখের কথায় বিজয়ার নারী-হৃদয় বিগলিত হইল। সেই হইতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার আসক্তি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। বিজয়ার হৃদয়ের দ্বন্দ্বটাই অধিক লক্ষ্য করিবার বস্তু। রাসবিহারীর কুটিল কৌশলজাল ও বিলাসের রূঢ় অভদ্রতায় সে একদিকে যেমন কাতর হইয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি নরেন্দ্রনাথকে পাইবার একটা সুষ্ঠু পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিল না। বিজয়া চিরদিনই ধর্ম্ম-ভাবাপন্না। ধর্ম্মের নামে সে স্বভাবতঃই একটু মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বিলাসই ব্রাহ্মমন্দির স্থাপনের কর্ত্তা। ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে বিলাস তাহারই পাশে নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে আসিয়া বসিলে বিজয়া তাহাতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার দয়ার ভাবটাই প্রথমে প্রকাশ হইয়াছিল।" "আর কিছু নয়—শুধু যদি তাহার সেই একান্ত দুঃসময়ে কিছু বেশী করিয়াও জিনিষের দামটা দেওয়া হইত।" পরে বিজয়া নরেন্দ্রকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্র উল্কার মত আসিয়া দর্শন দিতে বিজয়া আর আপনার সে-ভাব বজায় রাখিতে পারে নাই। নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার মনে মনে একটা টান ছিল। সে তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। এই শ্রদ্ধাই তাহার প্রণয়ের পথে আর এক রূপ। এই সপ্রণয় শ্রদ্ধার বশে সে নরেন্দ্রকে মনে মনে আপনার লোক বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিল। যখন এই ধারণাটা তাহার হৃদয়ে শিকড় বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল তখন সে খানিকটা বল সংগ্রহ করিয়া বিলাসকে উচিত শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল না। নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার আসক্তি বৃদ্ধি হইল। এই আসক্তিকে সে কোথায়ও বেশ পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই। ইহা তাহার নারী-জনোচিত সরম ও সঙ্কোচ। এখানে বলিয়া রাখা চলে যে, বিজয়া আলোকপ্রাপ্তা। যে-দিন সে এই সরম সঙ্কোচ দূর করিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল সেই দিনই

সে আপনার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে পারিয়াছিল। [১] বিজয়া-চরিত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্র যে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা উপভোগ্য ও মধুর। 'গৃহদাহে' তিনি অচলার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব অতি নিপুণ তুলিকায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অচলা বিজয়ার মত মধুর নহে।

'চরিত্রহীনে' সরোজিনী সতীশের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহার মিলনের পথে একটা প্রচণ্ড বাধা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমতঃ সরোজিনী তাহাদের নিজের বাড়ীতে সতীশকে দেখিতে পায়। সতীশ উপীনের সহিত আসিয়া জ্যোতিষবাবুর বাড়ীতে উঠিয়াছিল। সরোজিনী সতীশকে দেখিল—"কি সুন্দর বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, কপালে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম রহিয়াছে। সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখে রক্তাভা পড়িয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছে।" "ইহাতেই সরোজিনীর মন সতীশের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।" আর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবদ্ধ করিবার মত অর্থাৎ "খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিবার মত সতীশের চেহারাই বটে!" ইহাকে যদি "প্রথম দর্শনে প্রণয়" বলিতে হয় তবে তা' বলিতে পারা যায়। তারপর সরোজিনী উপীনের নিকট হইতে সতীশের গুণপণার পরিচয় পাইয়াছে। "ওকে চিন্‌তে পেরে ওর দোষ-গুণ সমস্ত বুঝে, যে ওর মন পাবে, সে বড় জিনিষটাই পাবে। কিন্তু পাওয়াই শক্ত। ও যে জটিল বা দুর্ব্বোধ, তা নয়, বরং খুব সোজা, খুব স্পষ্ট। আমার মনে হয় এত স্পষ্ট বলেই মানুষে ওকে ভুল বোঝে। মতের অনৈক্য হইলে আমরা যেখানে ভদ্রতার দোহাই পাড়ি এবং শিষ্টভাবে মতভেদ ক'রে মন ভার ক'রে চ'লে আসি, ও সেখানে হাতাহাতি ক'রে মীমাংসা করেই আসে, মন ভার ক'রে আসে না। ছেলেবেলা থেকে ওকে জানি,

(১) বিজয়া-চরিত্রের পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য 'দত্তা'-পরিচয় পুস্তক দেখা যাইতে পারে।

কখন দেখিনি—ওর মুখের কথা আর মনের কথা আলাদা হয়েছে। এত ভালবাসি এই জন্যই।” তারপর সে সতীশের গান শুনিয়া খুব মুগ্ধ হইয়াছে এবং সতীশের নিকটে গান শিখিতে পারিলে যেন তাহার বেশ হয়—এই রকম একটা বেশ সুখের কল্পনাও তাহার মনে স্থান পাইয়াছে। সে শুনিয়াছে—সতীশের বাবার আয় প্রায় দু'লাখ টাকা। সে পরের দায় ঘাড়ে তুলিয়া লইতে খুব মজবুত। স্বাস্থ্য, শক্তি, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, উদার হৃদয়—এ সব একজন শিক্ষিতা সুন্দরী যুবতীর পক্ষে লোভনীয়ই বটে! প্রথম দর্শনে সতীশের প্রতি সরোজিনীর আসক্তি বা মোহ জন্মিয়াছে। গুণপনা শ্রবণে আসক্তি অনেকটা দৃঢ় ভিত্তি পাইয়াছে অর্থাৎ “গুণে মন ভোর” হইয়াছে। কিন্তু যে-দিন সে উপীনের পত্র সতীশকে দিতে গিয়া তাহার বাসার পাচকের নিকট সতীশ ও সাবিত্রী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিল, সে-দিন তাহার মনটা সন্দেহে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সেইজন্য তাহার প্রেমের ভিত্তির উপর আর ইমারত গাঁথা হইল না। সাঁওতাল পরগণায় বেড়াইতে গিয়া যে-দিন সরোজিনী সতীশের দ্বারা কয়েকজন হিন্দুস্থানীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল, সে-দিন, তাহার ইমারত-গাঁথা যে-স্থানে বন্ধ ছিল সেইখান হইতে আবার সুরু হইল। যখন সরোজিনী সতীশের লালপাড় ধুতি পরিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে উদ্যত হইল তখন “সতীশের দু'চক্ষু যেন জুড়াইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া ফেলিল—কি চমৎকারই তোমাকে মানিয়েছে। যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণটি! কথা শুনিয়া সরোজিনীর শিরায় শিরায় পুলকের বান ডাকিয়া গেল। কাণের ভিতর দিয়া যে এত মধুও অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে, জীবনে আর কখনো সে এমন করিয়া অনুভব করে নাই। কিন্তু দারুণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া শুধু কহিল, যাও—(সতীশের প্রতি 'যাও' ক্রিয়াপদ ব্যবহার লক্ষনীয়) মাত্র দুটি

অক্ষরের একটি কথা। কিন্তু নিজের মুখের এই দুটি অক্ষর তাঁহার নিজের কাণেও আজ সুধাবৃষ্টি করিয়া দিল।" কিছুদিন হইতে শশাঙ্ক-মোহন নামধেয় যে নবীন ব্যারিষ্টার সরোজিনীকে অঙ্কগতা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল তাহার প্রতি সরোজিনীর লেশমাত্র আকর্ষণ ছিল না। সরোজিনীর প্রণয়ের ইমারত উপরের দিকেই উঠিতেছিল। সতীশকে না পাইলে তাহার চলে না, যেন তাহার নারী-জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। যে-দিন জ্যোতিষ বাবুর আহ্বানে সতীশ তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া সরোজিনীর সম্মুখেই সাবিত্রীর প্রতি তাহার আসক্তির কথা জানাইল, সে-দিন তাহা সরোজিনীর প্রণয়ের ইমারতে কতখানি প্রবল ধাক্কা দিল তাহা সতীশ জানিতে পারিল না। বুঝিতে পারিলে সে সাঁওতাল পরগণা হইতে বাড়ী চলিয়া যাইবার সময় সরোজিনীকে অন্ততঃ একবার জানাইয়া যাইত। সতীশ জ্যোতিষ-বাবুর বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেলে সরোজিনী মূর্চ্ছিত হইয়া কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সে বুঝিতে পারিয়াছে সতীশের সহিত মিলিত হইবার তাহার কোন আশা নাই। একে ত সতীশ অন্য নারীতে আসক্ত, তারপর জ্যোতিষ-বাবুই বা এই রকম পাত্রের সহিত জানিয়া শুনিয়া তাহার বিবাহ দিবেন কেন? সেইজন্য সে হতাশার আশ্বাসে শশাঙ্কমোহনের সহিত আলাপ করিতে বসিয়াছিল। কিন্তু সে সতীশকে হৃদয়ের গোপনপুরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। একদিন বিজয়াও নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া বিলাসের সহিত একটা আপোষ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যে-দিন সরোজিনী সতীশের চাকব বেহারীর নিকট হইতে আড়ালে সতীশ ও সাবিত্রীর সম্বন্ধে সব কথা জানিতে পারিল এবং যখন ইহাও জানিল যে সতীশের মত পুরুষের উপর সাবিত্রীর মত একজন মেসের দাসীর অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব আছে তখন সে

রাগে দুঃখে অভিমানে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেল এবং সতীশের বিপদের দিনে তাহাকে সাহায্য করিতে পারার নিজের অসামর্থ্য অনুভব করিয়া বেহারীর সম্মুখেই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সরোজিনী যদি অভিমান না করিত এবং বেহারীর নির্দ্দেশ মত সতীশকে সাহায্য করিতে যাইত তবে সতীশকে শেষে এত ক্লেশভোগ করিতে হইত না। কিন্তু সে-দিক্ দিয়া সরোজিনীর কোন উপায় ছিল না। আর তাহা হইলে হয়ত গ্রন্থকার সাবিত্রী, কিরণময়ী প্রভৃতির যে পরিণাম দেখাইয়াছেন তাহাও সম্ভব হইয়া উঠিত না।

যে-দিন উপেন্দ্র সতীশের অসুখ অবস্থায় তাহাকে দেখিতে যাইবার জন্য জ্যোতিষ-বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল সে-দিন সরোজিনী উপেন্দ্রকে পাইয়া অনেকটা বল সঞ্চয় করিয়া লইয়া সমস্ত সরম-সঙ্কোচের পর্দ্দা দুইহাতে সরাইয়া ফেলিয়া দিয়া সতীশকে আপনার অন্তরের সেবা দিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার আশায় উপেন্দ্রের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। শশাঙ্কমোহনের সহিত তাহার সম্বন্ধটা পাকা করিবার জন্য যে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল তাহাকে যেন সে একেবারে দুই পায়ে দলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। জ্যোতিষ-বাবু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—তার (সতীশের) অসুখ তো তোর কি? সরোজিনী শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—আমি যাবো না তো যাবে কে? সরোজিনী মনে মনে আপনাকে সতীশের ধর্ম্মপত্নীর আসনে বসাইয়া রাখিয়াছিল। সরোজিনীর প্রণয়ের ইমারত গড়িয়া উঠিল। সে সতীশের সহিত মিলিত হইল। সরোজিনীর প্রণয়ের পথের বাধা বাহির হইতে আসিয়াছিল। সে সতীশকে ভালবাসিয়াছিল। সে সতীশের মুখ হইতে তাহার অন্য নারীর প্রতি আসক্তির কথা শুনিয়াছে। ইহাতে তাহার মনে অভিমান জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সতীশকে হৃদয় হইতে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারে নাই।

এই অভিমানের বশে হয়ত তাহার সতীশকে হারাইতে হইত—তখন তাহার অবস্থা যাহা দাঁড়াইত তাহার পরিচয় তাহার মূর্চ্ছা হইতেই পাওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ইহার পরেই তাহার শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারই পতন ঘটিত। সতীশের প্রতি সরোজিনীর প্রণয়ের কাহিনী 'চরিত্রহীনে'র আখ্যান-বস্তুর একাংশ মাত্র।

'ছবি' গল্পে দেখা যায়, দেবদাস ও পার্ব্বতীর প্রণয়ের মত বা-থিন ও মা-শোয়ের মধ্যে ছেলেবেলায় ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তাহারা ছেলে-বেলায় "খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মার-পিট্ করিয়াছে, আর ভালবাসিয়াছে।" 'দত্তা'র বিজয়ার মত মা-শোয়ে বাগ্‌দত্তা। মা-শোয়ের পিতা মৃত্যুকালে বা-থিনের পিতাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব। উত্তরাধিকার-সূত্রে বিজয়ার মত মা-শোয়েই. বা-থিনের মহাজন। 'দত্তা'য় নরেন্দ্র যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়া নিমগ্ন হইয়া থাকিত, 'ছবি' গল্পে বা-থিনও চিত্রাঙ্কন লইয়া মগ্ন থাকিত। মা-শোয়ের হৃদয়ে বা-থিনই প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। সেখানে পো-থিনের জন্য কোন আসন ছিল না। কিন্তু মা-শোয়ে ধনী-কন্যা, অভিমানিনী, পান হইতে চূণ খসিলেই তাহার অভিমান চড়িয়া যায়। বা-থিনের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় মা-শোয়ের শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু সে তাহাতে আনন্দ পায় না। মা-শোয়ে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ শিল্পী বা-থিনকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে, হাসি-তামাসা উপভোগ করিতে, লঘু চিত্তের অবাধ খেয়াল চরিতার্থ করিতে চায়। বা-থিনের কিন্তু সে-দিকে মন দিলে চলে না। সে মা-শোয়ের নিকট ঋণী'। সে ছবি আঁকিয়া তাহার দেনা পরিশোধ করিতে চায়। সেইজন্য যাহাতে তাহার সময় বৃথা নষ্ট হইয়া না যায় সে-দিকে সে অত্যন্ত সতর্ক। মা-শোয়ে ইহাতে বিরক্ত হয়, অভিমান করিয়া

বসে। এই অভিমানের বশেই সে, বা-থিন তাহার বাড়ীতে আসিলে তাহাকে অপমানিত করিয়াছে। মা-শোয়ের অভিমানটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের। যে-দিন সে বা-থিনকে তাহার ঋণের দায়ে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা তাহারই নিকট অর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে আসিতে দেখিল, সে-দিন মা-শোয়ে আপনার অভিমানের ফল বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, সে আজ বৃথা অভিমানের বশে তুচ্ছ ঋণের বিনিময়ে কি অমূল্য সম্পদ্ হারাইতে বসিয়াছে। তারপর উভয়ে মিলিত হইল, বা-থিনের আর দেশত্যাগ হইল না। এখানে মা-শোয়ের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব নাই, আছে তাহার অর্থের গর্ব্ব, আর খানিকটা আভিজাত্য, দম্ভ ও অভিমান—যা' সম্পূর্ণ বাহ্য বস্তু বলিলেই চলে।

'পথ-নির্দ্দেশ' গল্পে দেখা যায়, হেমনলিনী তাহার মাতার সহিত তাহাদের বড় দুঃখের সময় গুণীর নিকটে আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু গুণী সুলোচনাকে মা বলিয়া ডাকায় ও সেই সম্বন্ধ লইয়া হেম গুণীকে দাদা বলিয়া ডাকায় এবং গুণীর উদার চরিত্রের সারল্যে হেম ও গুণীর মধ্যে আশ্রিত ও আশ্রয়-দাতার সম্বন্ধ এক প্রকার প্রথম হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিনের মিলামিশার পর উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই প্রণয়ের শিকড় হেমের মনে এমন ভাবে গভীর হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, তাহাকে কোন দিন কোন কারণে গুণীর বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে হইবে—একথা সে কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। সেইজন্য যখন তাহার বিবাহের কথা উঠিল এবং হেমও তাহা জানিতে পারিল তখন সে অসঙ্কোচে বিবাহে অসম্মতি জানাইয়াছে। "আমি যদি বিয়ে না করি, তোমরা কি জোর করে আমার হাত-পা বেঁধে দিতে পার?" "আমি কিছুতেই এ বাড়ী ছেড়ে যাব না—তা তোমরা কেন যত

মতলবই কর না।" "আমি তোমাদের বোঝা হ'য়ে থাকি, আমাকে খেতে দিতে হবে না, আমি উপোষ করে আমার পড়্‌বার ঘরে পড়ে থাক্‌ব—আমি কিছুই চাইব না।" "তোমার দুটি পায়ে পড়ি, গুণি-দা, তুমি সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও।"—৩য় পরিচ্ছেদ। নিজের বিবাহে আর কেহ বোধ হয় এমন স্পষ্টভাবে অসম্মতি জানায় নাই। হেম হিন্দু, গুণী ব্রাহ্ম। আহারাদির ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা হেম এত দিন মানিয়া আসিয়াছিল। সে-দিন গুণীর একটা কথায় (তোমার মানদা দাসী ঢুক্‌লে জাত যায় না—আমি কি তার চেয়ে ছোট?) তাহার চোখ ফুটিতেই সে এই বৈষম্যটা একেবারে দূর করিয়া ফেলিবার জন্য পরদিন গুণীর পাতে বসিয়া তাহার ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য এই ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করার মধ্যে হেমের সংজ্ঞাত তৃপ্তিলাভ যতখানি, বাহ্য বৈষম্য দূরীকরণের স্বাচ্ছন্দ্য ততখানি নয়। তাহার মা তাঁহাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া আসিতে বলায় সে বলিয়াছিল—"গুণী-দার এঁটো পাতে ব'সে খাবার যোগ্যতা সংসারের ক'জনের ভাগ্যে আছে? এ-পাতে খেতে পাওয়া ভাগ্য।" গুণীর কথার উত্তরে সে বলিল—"তোমার পাতে ব'সে খেলে কারু জাত যায় না—যারা জাত তৈরী ক'রেছে—তাদেরও না। তোমার পাতে বসে খেলে মা দুঃখ পান—না খেলে মার চেয়ে যিনি বড় তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়।"—৩য় পরিচ্ছেদ।

হেমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। স্বামীর আলয়ে গিয়া হেম স্বামীকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতে পারিল না। সে গুণীর জন্য উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহিল। বৎসরান্তে স্বামীর মৃত্যুর পর গুণীর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তাহার বিবাহিত স্বামীর অসুখ, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ ও তাহার আসার কথা এমন অবলীলাক্রমে বলিয়া গেল, যেন তাহার মনের মধ্যে স্বামীর গৃহের কোন আঁচড় নাই, যেন সে একটা কি

কর্ত্তব্য শেষ করিতে গিয়াছিল, তাহা অতি সহজে শেষ করিয়া আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে শুধু পরিধানে তাহার রীতি-মাফিক থান কাপড়।

মাতার মৃত্যুর পর কিছুদিন অতীত হইলে হেম একদিন গুণীকে বলিল—আমি তোমার কাছে দীক্ষা নেব (জানি না প্রেমের দীক্ষা কিনা)। যখন সে ক্রমে অন্তরে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল তখন সে একদিন গুণীকে জিজ্ঞাসা করিল—বিধবার বিবাহ হওয়া কি ভাল? বিধবা বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ এই যে, যদি তাহার সহিত বিবাহে গুণীদার আপত্তি না থাকে তবে সে তাহাতেই তৎক্ষণাৎ রাজী। কথায় কথায় যখন গুণী জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার স্বামীকে তুমি ভাল-বাস্‌তে কি?" হেম সোজাভাবে উত্তর দিয়াছিল—একটুও না। সে কথা আমার কোন দিন মনে হয়নি। সেখানকার একটি পয়সার জিনিষ সঙ্গে আনিনি। তাদের দেওয়া একখানি কাপড় পর্য্যন্ত পরে আসিনি। পেটে যা খেয়েছি, তার চতুর্গুণ দিয়ে এসেছি—এম্‌নি তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।" "আমিও সতী-লক্ষ্মী, তাই মরণকালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি—এই কথাই মনে কর্‌ব। আচ্ছা, গুণিদা, ম'রে কি তোমার কাছে যেতে পার্‌ব?" এমন করিয়া খুব কম নারীই প্রেমাস্পদের নিকট আপনাকে ধরা দেয়। হেম গুণীর নিকট হইতে আপনার অভীপ্সিত সম্মতি পায় নাই। সেইজন্য তাহার প্রেমের স্রোত রুদ্ধ না হইলেও মনের গতি ভিন্ন পথে চলিয়াছে। গুণী নিজে যখন তাহার কাছে আপনার সম্মতি জানাইল তখন হেম আর তাহাতে সাড়া দেয় নাই। সে তখন আপনাকে অনেকখানি সংযত করিয়া ফেলিয়াছে। সে সংস্কার মানিয়া চলিবার মিথ্যা আচ্ছাদনে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য খাড়া হইয়া মুহূর্ত্তকাল আপনাকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

এই দৃঢ়তার বশে সে, গুণী যখন বলিয়াছিল, 'কিন্তু যদি কোন দিন তোমার মতি ফেরে, আর তখনও যদি আমি বেঁচে থাকি—এস'—তখন বলিয়াছিল, যে রক্ষক, সেই ভক্ষক! শেষকালে তুমিই আমাকে দুর্গতির পথে টেনে আনতে চাও।" "বিধবার আবার বিবাহ কি? আমি এত শিশু নই যে, ধর্ম্মের ভাণ করলেই অধর্ম্মের পথে পা বাড়িয়ে দেব।" কিন্তু যে সংস্কার-বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তাহার দৃঢ়তা, তাহাই যে ক্ষীণ। সে তাহার বিবাহিত স্বামীর ভিটাকে কাশী, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি উচ্চ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া সেখানে গিয়া বাসা বাঁধিলেও গুণী তাহার বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল। সেখান হইতে সে কেমন করিয়া তাহাকে নড়াইবে? তাহার সংস্কার-বুদ্ধি আদৌ প্রবল ছিল না, তার সঙ্গে ছিল খানিকটা অভিমান। যে-দিন সে গুণীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল সে-দিনও সে পত্নীত্বের দাবী লইয়াই আসিয়াছিল। শরৎচন্দ্র এখানে সংস্কার তথা সংযম ও সম্ভোগেচ্ছার যে সংঘর্ষ দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে বিশ্লেষণেব দিক্ দিয়া নিপুণ ভাবে উপকরণ সাজাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যের অভাব রহিয়া গিয়াছে। কারণ সেই মামুলি কথা—আকর্ষণ, প্রেম, পরিত্যাগ ও পুনর্মিলন। সম্ভোগেচ্ছা যেখানে অতি প্রবল, সংস্কার ও সংযম সেখানে অতি ক্ষীণ, সেখানে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে বিষম কিন্তু ফল হইয়াছে অকথ্য।

'পল্লী-সমাজে' রমা ও রমেশের প্রণয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল পাঠশালায়। রমেশ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যায়, এদিকে রমারও বিবাহ হইয়া যায় এবং পরে বৈধব্য ঘটে। কিন্তু রমা রমেশকে অন্তরে ভালবাসে। রমার অন্তরে রমেশই দেবতা। রমেশকে যত্ন-আদর করিবার ইচ্ছাটাও তাহার হৃদয়ে প্রবল। সে তাহার যতীনকে রমেশের সম্বন্ধে যে ভাবে প্রশ্ন করিতেছে তাহাতে রমেশের প্রতি তাহার ভালবাসাটাই

সূচিত হয়। কিন্তু তাহার প্রণয় প্রকাশের পথে বাধা আছে—সমাজে তাহার কলঙ্ক-ভীতি। সেইজন্য রমা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পারিবারিক কলহটাকে বড় করিয়াছে মাত্র; মাত্র কলহকেই অবলম্বন করিয়া সে তাহার অসংজ্ঞাত মন, সংযত প্রবৃত্তি ও সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের সহিত একাধারে বনিবনাও করিয়াছে। রমা সত্যই তাহার অন্তরের ভালবাসা অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া, রমেশের সঙ্গে যে কোন সম্বন্ধ নাই তাহা উৎকট ভাবে প্রকট করিয়া তুলিবার জন্য, রমেশের সহিত কলহ মিটাইবার পরিবর্ত্তে জিয়াইয়া রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে, রমেশের আর এক শত্রু বেণীর সহিত সে সহযোগিতা করিয়াছে। বেণী রমেশের পিতার শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিতেই রমা বলিয়াছে—"আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ী।" "(রমেশ এ বাড়ীতে আসিলে) আমি কিছুই বল্‌বো না, বাইরে দরওয়ান তার উত্তর দেবে।" "তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। রমেশ সেই শত্রুর ছেলে ত! তা'ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার যো নেই।" (এখানে যাবার যো নাই কেন তাহার অনুল্লেখ লক্ষণীয়)। রমেশের প্রতি তাহার আসক্তিটা পাছে কোনও দিক্ দিয়া এতটুকু প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কাটা হয়ত তাহার মনের কোণে একবার উঁকি মারিয়া গেল। রমেশ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই রমা দরওয়ান দেখাইয়া দেওয়া ত দূরের কথা, তাহার প্রতি কটু কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না। মাসী রমেশকে তিরস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া সে মাসীকেই বিদ্রূপ করিল। সমাজের কলঙ্কের ভয় একেবারে না থাকিলে সে অবাধে তাহাদের পারিপারিক কলহটা অবসান করিয়া ফেলিতে পারিত। রমেশ যে রমাকে বিশ্বাস করে তাহা সে বিশ্বেশ্বরীর নিকট হইতে শুনিয়াছিল। তাহাদের সমাজ হইতে দূরে তারকেশ্বরে

রমেশের সহিত দেখা হওয়ায় সে তাহাকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিয়া যত্ন-আদর করিয়া খাওয়াইয়াছে। তাহার নারী-জীবনের পক্ষে অন্ততঃ সে-দিনটা যে সার্থক তাহা সে উপলব্ধি করিয়াছে। রমেশ যে তাহাকে পূর্ব্বেরই মত প্রীতির চক্ষে দেখে তাহা সে জানিয়াছে। এতদিন রমেশের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিয়া সে অন্তরে যে যন্ত্রণায় জ্বলিতেছিল তাহারই খানিকটা সে-দিন সে চোখের জলে ধুইয়া দিয়া আপনাকে কিছু হাল্কা করিয়াছে।

তারকেশ্বর হইতে ফিরিবার পর যে-দিন রমেশ নিজে রমার নিকট গিয়া প্রজাদের উপকারের জন্য বাঁধের জল বাহির করিয়া দিবার সম্মতি চাহিয়াছে, সে-দিন রমা যেন একটা ঝোঁকের বশেই রমেশের বিরুদ্ধতা করিয়াছে। রমেশ যখন তাহার লাঠিয়ালকে ঘাএল করিয়া দিয়া বাঁধ কাটাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া দিল, তখন তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—তাহার বুকের উপর হইতে একটা গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল। সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না। সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই তাহার চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া ও এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়া ছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এ সবই প্রণয়ের চিহ্ন। রমা রমেশকে হৃদয়-মন্দির হইতে দূর করিতে পারে নাই। ইহার পর যখন তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক সমাজে ছড়াইয়া পড়িল তখন সে যে কোন প্রকারে রমেশকে সমর্থন করিতে পারে তাহার আর উপায় রহিল না। সে রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। যে-সমাজের ভয়ে সে হৃদয়-দেবতা রমেশকে কারাগারে পাঠাইয়া দিল সে-সমাজ কোথায়? না, বেণী প্রভৃতি

কয়েকজন হীনমনাঃ সমাজপতির নীচ স্বার্থ ও ক্রুর হিংসার মধ্যে! তবুও রমা এই সমাজকে পদদলিত করিতে পারিল না। এইখানেই তাহার দুর্ব্বলতা—অবশ্য তাহা হৃদয়ের নয়, মনের নয়, তবে আত্মিক বলের বা প্রেমের—যে-প্রেম জীবন ও মৃত্যুর পথে, উৎসবের প্রাঙ্গণে এবং কারাগারে, দুঃখে এবং শোকে তাহার ব্যথাক্ষুব্ধ, ক্লান্ত ও অশান্ত আত্মাকে এবং তাহার প্রেমাস্পদের অক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার অভিযানকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। এই মিথ্যা দুর্নীতিপরায়ণ সমাজের অমঙ্গলকর ভয়ে সে রমেশের জীবনটাকে একেবারে দগ্ধ করিয়া দিল। রমাও সমাজের সমাজপতিদের অন্যতম। কিন্তু সে নারী। তাহার নারীজনোচিত সরম ও সঙ্কোচ তাহার সমাজের আশঙ্কাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে দেয় নাই। সেইজন্য দুঃখিনী রমার জীবন ও যৌবন ব্যর্থ। রমা নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছে এবং সামাজিক ইতিহাসের এক কোণে সে গভীর করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে যে, এই সমাজে নারীর বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটে না। কিন্তু তাহার রূপের মূল্য থাকা তো দূরের কথা, তাহার মহৎ প্রাণের কিছুমাত্র মর্য্যাদা হয় নাই। সেইজন্য শরৎচন্দ্র সমাজ ও সমাজপতিকে যতই দুর্নীতিপূর্ণ ও দুরভিসন্ধি-পরায়ণ করিয়াছেন ততই রমাকে মনে হয়, সে দীনা নয়, দুঃখিনী নয়, হেয়া নয়, যৌবনের ব্যর্থতায় তাহার শেষ নয়, আত্মার দুর্ব্বলতায় তাহার রহস্যভরা সোৎসুক অথচ সৌম্য জীবন লুকান রহিয়াছে। সেখানে সে রমেশকে ভালবাসিয়া, আদর্শ ভাবিয়া, শ্রদ্ধা করিয়া, আমরণ প্রেমের বন্ধন শ্লথ না করিয়া এবং যতীনকে তাহারই আদর্শে গড়িয়া তুলিবার ভার দিয়া দুঃখকে তাহার অমৃতত্বের পাথেয় এবং জীবনের অশ্রুকে অনন্তজীবন বা প্রেমের উৎস করিয়াছে। নিষ্ঠুর সমাজের অন্যায় শাসন ও অসহ্য বিধির নিকট দুইটি মহৎ প্রাণ বলি পড়িল। রমেশই রমার পতি

এই দিক্ দিয়া রমা ও রমেশ যে নাম দুইটি শরৎচন্দ্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন ইহার মধ্যেও একটা মধুর সঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে।

আরও বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, রমার যে দুর্ব্বলতার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি উহা তাহার নারীহৃদয়ের নয়, কারণ রমা সমাজপতি; হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া যায় এই আশঙ্কায় সনাতন পন্থীর দল কোন দিন রমার এই দুর্ব্বলতা আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হন নাই।

'পল্লী-সমাজ' বাস্তব চিত্র। ইহার মধ্যে শরৎচন্দ্রের আদর্শস্থাপনের প্রয়াস নাই। তিনি ইহার মধ্যে বলিতে চাহিয়াছেন—'এই পাড়াগাঁয়ের সমাজ, যাকে সহর থেকে মনে কচ্ছি—সেখানে পদ্ম ফুট্‌ছে, মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেমে গলাগলি কচ্ছে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাচ্ছে এই সব, সেখানেও পুকুরে শালুক ফুট্‌ছে, বিলাতী কচুরীতে সব ছেয়ে গেছে; দলাদলির তো অন্তই নাই।······গ্রামে নায়কের মত একটা মহৎ প্রাণ এলো, নায়িকার মত মহৎ নারী এলেন। সমাজ তাঁদের উৎপীড়ন কর্‌লে, সমাজের তাতে কি gain হলো! এই দুটি জীবনের যদি মিলন হতে পারতো, এ জিনিষটা যদি সমাজ নিতে পারতো, তবে তারা দশখানা গ্রামের আদর্শ হতো। (আমরা এ বিষয়ে একমত)। আমরা তাদের repress করলাম; দুটো জীবন ব্যর্থ করে দিলাম।' সেইজন্য conclusionও ছত্রভঙ্গ ধরণের হইয়া গিয়াছে।

নারী-চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের যে কেবল দরদ দেখা যায় তাহা নহে, তাহাতে শিল্পীর নিপুণতাও আছে। শরৎচন্দ্র নারী-চরিত্রের সচেতন মন ও অবচেতন আত্মার সম্বন্ধ ও সংঘর্ষ যে যে পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন সেইগুলির মধ্যে 'গৃহদাহ' উপন্যাসখানি অন্যতম। কিন্তু ইহা একেবারে অনবদ্য নহে। এতদিন গল্পে, উপন্যাসে নায়ক, নায়িকা

ও প্রতিনায়ক, প্রতিনায়িকার খেলাই দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। এইবার দেখা গেল, উপন্যাসের একজন মাত্র নায়িকা কিন্তু দুইজন নায়ক। Single নায়িকার সহিত double নায়কের সম্বন্ধ দেখাইতে গিয়া গৃহদাহ শেষ হইল, অন্তর্দাহ আরম্ভ হইল। এখন কেমন করিয়া গৃহদাহ হইল তাহার আলোচনা করা যাউক।

অচলা এই গৃহদাহের নিমিত্ত। সে গম্ভীর-প্রকৃতি মহিমকে ভালবাসিয়াছে। সে মহিমের ঘর-বাড়ী, আর্থিক অবস্থার কথা সব জানিয়াছে। সে শুনিয়াছে—পল্লীগ্রামে মহিমের একখানি কাঁচা বাড়ী আছে, সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাতে কোন রকমে দুঃখে কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র। অচলা নিজে অবস্থাপন্ন লোকের কন্যা। সে ব্রাহ্ম-সমাজের, সহরে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে। মহিম ও অচলার মধ্যে নানা দিক্ দিয়া বৈষম্য থাকিলেও অচলা মহিমকে ভালবাসিয়াছে। এ অবস্থায় বলা চলে মহিমের প্রতি অচলার আসক্তি আন্তরিক। তারপর মহিমের বন্ধু সুরেশ আসিয়া জুটিল। অচলা সুরেশের কথা মহিমের নিকটেই শুনিয়াছিল। সে আরও শুনিয়াছিল যে, সুরেশই দুইবার মহিমকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। সেই কারণে সুরেশের উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল। অচলার সহিত আলাপ হওয়ার পর সুরেশ একদিন তাহাকে প্রেম-নিবেদন করিয়াছে। সে অচলার বাপের ঋণের দায় যাচিয়া আপনার ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছে। কিন্তু অচলা তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সে মহিমের প্রতি যে-ভালবাসা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল তাহাই অতি সন্তর্পণে অন্তরে অন্তরে বহিয়াছে। সে একদিন মহিমকে বলিয়াছিল—"তুমি কি তোমার কষাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্য রেখে গেলে? যে তোমার উপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্ছ কি

বলে? দেখি তোমার ডান হাতটি বলিয়া নিজেই মহিমের হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙ্গুল হইতে সোণার আঙ্‌টিটি খুলিয়া তাহার আঙ্গুলে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল—"আমি আর ভাব্‌তে পারিনে, এইবার যা কর্‌বার তুমি কোরো।"—১২শ পরিচ্ছেদ। ইহাতেই অচলা আপনাকে মহিমের নিকট চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এখনও তাহার হৃদয়ের কোন কোণে সুরেশের জন্য স্থান নাই। যে-দিন সুরেশ প্লেগ-রোগাক্রান্ত বন্ধু নিশীথকে দেখিতে যাইবার জন্য অচলার সম্মুখে মহিমকেই ডাকিয়াছিল সে-দিন অচলা মহিমকে সুরেশের সহিত যাইতে দেয় নাই। সুরেশের প্রেমের অভিনয় তাহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল সে-দিন সে তাহার পিতাকেই বলিয়াছিল—"না, বাবা, রাত্রিদিন এত পীড়ন আর আমি সহ্য কর্‌তে পারিনে, যা একেবারে অসম্ভব, যা প্রাণ থাক্‌তে স্বীকার কর্‌বার আমার একেবারে যো নেই, তাই নিয়ে তোমরা আমাকে অহর্নিশ বিঁধ্‌ছ।" এখনও দেখা যাইতেছে, অচলা পূর্ব্বেরই ন্যায় মহিমের প্রতি আসক্তা।

মহিমের সহিত অচলার বিবাহ স্থির। এমন সময়ে অচলা সংবাদ-পত্র পড়িয়া সুরেশের পরোপকারার্থে বিপদাপন্ন হওয়ার কাহিনী জানিতে পারিল। সুরেশও সেই দিন কেদার-বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচলা সুরেশের মুখে তাহার বিপদের কাহিনী সবিস্তারে জানিল। দুঃখের কথায় নারী হৃদয় বিগলিত হওয়া আশ্চর্য্যের নহে। সুরেশ যে পরের জন্য নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল ইহাতে সুরেশের উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল।

মহিমের সহিত অচলার বিবাহ হইয়া গেল। "মহিমের অচল গাম্ভীর্য্য আজও অক্ষুণ্ণ রহিল। আনন্দ-নিরানন্দের লেশমাত্র বাহ্য-প্রকাশ তাহার মুখের উপর দেখা দিল না। তবুও শুভদৃষ্টির সময় এই মুখ

দেখিয়াই অচলার সমস্ত বক্ষ আনন্দে, মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে স্বামীর পদতলে মাথা পাতিয়া মনে মনে বলিল—"প্রভু, আমি আর ভয় করিনে, তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকিনে কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিনই তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ।"

স্বামীর আলয়ে আসিয়া পল্লীগ্রামের কর্দ্দমাক্ত পথ, স্যাঁৎসেঁতে কাঁচা বাড়ী প্রভৃতি দেখিয়া অচলার স্বামীসুখ ও বিবাহের আনন্দের কল্পনা কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল। পাড়া-প্রতিবেশীর 'বেম্ম', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি দুই একটা বিশেষণ যে তাহার কাণে আসিয়া না পৌঁছিয়াছিল এমনও নয়। তা' ছাড়া যাহাদের সহিত তাহার ঠাট্টার সম্বন্ধ তাহাদের বিশ্রী ধরণের পরিহাস, নির্ল্লজ্জ প্রগল্‌ভতা প্রভৃতি তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। এ সমস্ত অসুবিধা ও অসামঞ্জস্য সে কোন রকমে ধীরে ধীরে মানাইয়া লইতেছিল, কিন্তু একটা বিষয়ে তাহার মনের খট্‌কা কিছুতেই দূর হইতেছিল না। স্বামীপ্রেমে অন্য নারী আসিয়া ভাগ বসায় ইহা কোন নারীই সহ্য করিতে পারে না—অচলার মনের খট্‌কা এই দিক্ দিয়াই ছিল। "এ বাটীতে পা দিয়া পর্য্যন্তই যখনই তাহাকে (মৃণালকে) স্বামীর সঙ্গে কোন একটা হাসি-তামাসা করিতে দেখিয়াছে, তখন তাহার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে যেন সূঁচ ফুটিতে লাগিল।" "মহিমের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এইখানে যেন অতিশয় বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হয়, সে এই বলিয়া বিতর্ক করিতে থাকে, ভিতরে যদি কিছুই নাই তবে পরিহাসের জবাব পরিহাস দিয়া করিতেই বা দোষ কি? যে তামাসা করিয়া উত্তর দিতে পারে না, সে ত অন্ততঃ হাসিমুখে সেটা উপভোগ করিতেও পারে! অথচ সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়, মৃণালের

রহস্যালাপের সূত্রপাতেই মহিম লজ্জিতমুখে কোনমতে তাড়াতাড়ি অন্যত্র পলাইয়া বাঁচে। তাই, কোথায় কি একটা যেন প্রচ্ছন্ন অন্যায় রহিয়াছে, আজকাল এ চিন্তা কোন মতেই সে মন হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইতে পারে না"—১৫শ পরিচ্ছেদ। ইহার পর একদিন মৃণালের সহিত অচলা ঝগড়া করিয়াছিল বলিয়া মহিমের সহিত তাহার কথা কাটাকাটি হইয়াছে। এম্‌নি সময় অচলার ক্ষুব্ধ চিত্তে চাঞ্চল্যের আগুন ধরাইয়া দিবার জন্যই যেন সুরেশ আসিয়া দর্শন দিল। নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্য দিয়া মহিমের উপরে অচলা বিরক্ত হইয়াই ছিল। তারপর তাহার পিতার অসুখের কথার উল্লেখে মহিম তেমন কান দেয় নাই বলিয়া অচলা তাহার উপর আরও বিরক্ত হইয়াছে। সুরেশের হৃদয়ের ঝোঁকের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না, তবুও অজ্ঞাতসারে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সে সুরেশের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। ইহার জন্য সুরেশ, অচলা, মহিম ও মৃণালের যে কেহ মুখ্যভাবে বা গৌণভাবেই দায়ী হউক না কেন, অচলার শিক্ষা, প্রকৃতি, রীতিনীতি ও সমাজ কম দায়ী নয়। সুরেশ তাহাদের বাড়ী হইতে কলিকাতা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সে সহসা মহিমের সম্মুখেই সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিয়াছে—"তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না, সুরেশবাবু। কিন্তু তুমি ছাড়া আর অসময়ের বন্ধু কেউ নেই, তুমি বাবাকে গিয়ে বোলো, এরা আমাকে বন্ধ ক'রে রেখেছে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে ম'রে যাবো। সুরেশ বাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর কয়্বার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না।" কথাগুলা সে নিতান্ত উত্তেজনার বশেই বলিয়া গেল। এই স্থানে সে নারীর সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলিল। এই স্থান হইতে তাহার সংঘর্ষশীল মনের গতি বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ইহার পর যখন সে টেবিলের উপর মৃণালের পত্র দেখিতে পাইল তখন মহিমের সহিত বুঝাপড়া করিবার মত আর উপায় রহিল না।

মহিমের গৃহদাহ হইবার পরদিন যখন অচলা স্বচক্ষে তাহার দুর্দ্দশা দেখিল এবং তাহাকে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিতে শুনিল— "আমি যাঁকে ঘরে এনেছি, তাঁর পুণ্যে ঘর থাকে ভালই, না হয় বার বার পুড়ে যায়, সেও আমার সহ্য হবে," তখন তাহার হৃদয়ের জ্বালা নিবিয়া গেল। কিন্তু সে তাহার গহনা দিয়া মহিমকে সাহায্য করিতে চাহিলে মহিম যখন তাহা প্রত্যাখান করিল এবং তাহাকে তাহার ঝোঁকের কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল তখন তাহার হৃদয় পুনরায় বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। সেই সময় মৃণালের কথাটাও তাহার আবার মনে পড়িয়া গেল। অচলা সুরেশের সহিত কলিকাতা চলিয়া গেল।

হারাইয়া অভাব বোধ হইলে তবেই জিনিষের মূল্য সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। অচলা স্বামীকে হারাইয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, সত্যই তাহার কি অমূল্য সম্পদ খোয়া গিয়াছে। আজ সে তাহাই ফিরিয়া পাইলে দু'হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে আর কিছুতেই আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দিবে না। মহিমের কঠিন ব্যারামের সময় অচলা তাহার প্রাণ-ঢালা সেবার মধ্য দিয়াই আবার তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছে। সুরেশের সহিত পাছে নির্জ্জনে দেখা হয় এই ভয়ে সে বড় একটা মহিমের ঘর ছাড়িয়া যায় না। ইহার পর শরৎচন্দ্র তাহার সচেতন মন ও অচেতন মন লইয়া যে ভানুমতীর খেলা দেখাইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। একদিন সকালে মহিম অচলার গায়ের চাদরখানির প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সে বুঝিতে পারিল, সে রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলে সুরেশই তাহার গায়ে তাহার নিজের গায়ের কাপড়খানি দিয়া গিয়াছিল। "এই কদাচারে তাহার লজ্জার পরিসীমা রহিল না, এবং

ইহাকে সে কুৎসিত বলিয়া, গর্হিত বলিয়া, অভদ্র বলিয়া সহস্র প্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল এবং অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর এই চৌর্য্য-বৃত্তিকে সে কোন দিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিল ; কিন্তু তথাপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কোন মতেই সায় দিতেছে না, ইহাও যে তাহার অগোচর রহিল না।” বাহিরে সংজ্ঞাত মনে সে জোর করিয়া মহিমকে ও ভিতরে অবজ্ঞাত চেতনায় আপনা হইতে সুরেশকে কেমন ভাবে স্থান দিয়া চলিয়াছে ইহাই শরৎচন্দ্র দেখাইতেছেন। সে মহিমকে পাইয়াছে, তাই বলিয়া সে সুরেশকে একেবারে দূরে ঠেলিয়া দেয় নাই। এই স্থানে শরৎচন্দ্র অচলার অবচেতন আত্মার খেলাটাকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। সেজন্য তিনি অবশ্য স্বাভাবিক অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখেন নাই। যেখানে অচেতন আত্মা সুগুপ্ত, সেখানে পরিবর্ত্তনশীল অজ্ঞাত আঁত্মা ও আত্মিক শক্তি তথা প্রচেষ্টাগত প্রেম এম্‌নি ভাবেই প্রকাশ পায়। মুহূর্ত্তেই কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠে, আবার মুহূর্ত্তেই শ্রাবণের ধারা বহিয়া যায়। সেই জন্য সুরেশ যখন মহিমের বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইবার পূর্ব্বে অচলাকে বলিল, কতকাল হয়ত আর দেখা হবে না—তখন অচলা কাঁদিয়া আকুল হইল। সুরেশের স্বাস্থ্যের ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া সে বলিয়া ফেলিল—তোমার কখ্‌খনো শরীর ভাল নেই, সুরেশ বাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। যে-সুরেশের সঙ্গ সে এড়াইয়াছে তাহাকেই আবার সে সঙ্গে লইতে চায়। সুরেশের স্বাস্থ্য, দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িবার মত হীন ছিল না। এই অংশকে সচেতন মন বা অচেতন আত্মার খেলা বলিয়া সমর্থন করিতে হইলে সনাতনপন্থীদিগের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে সত্য, কিন্তু সত্যই ইহা অতিশয়তা নয়। সমাজ, শিক্ষা, প্রকৃতি, রীতি, নীতি ও সর্ব্বোপরি অনভ্যস্ত সহনশীলতার মধ্যে সংজ্ঞাত ও অসংযত মনই ইহার জন্য দায়ী।

মহিমকে লইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইবার সময় ট্রেনে অপরিচিত মেয়েটি যখন সুরেশকে দেখাইয়া অচলাকে বলিল—'উনিই বুঝি আপনার বাবু', অচলা উত্তর দিল 'হুঁ'; ইহাও কি অবচেতন মনের অতর্কিতপ্রকাশ, না, আলোকপ্রাপ্তা অচলার ছলনা-জীবনের বহির্বিকাশ? একদিন 'চরিত্রহীনে' কিরণময়ীও কামিনী বোষ্টমীর নিকট আপনার ও দিবাকরের মধ্যে সম্বন্ধটা বলিবার প্রথম টালটা এম্‌নি কথার কারসাজিতে সারিয়া লইয়াছিল। অচলা যখন 'হুঁ', বলিয়াছিল তখন তাহার মনে ছিল না—এই বলিয়া শরৎচন্দ্র বিশ্লেষণ-শক্তির নিপুণ তুলিকায় জবানী কাটিয়াছেন, কিন্তু কে না বলিবে, যে, তিনি এই জবানী দ্বারা সমালোচকদিগের কটু ইঙ্গিত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। যে সুরেশ রুগ্ন মহিমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহাকে অসৎ উদ্দেশ্যে আজ উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, যে তাহাকে 'গণিকা' বলিয়া অপমান করিয়াছে, কুৎসিত বিদ্রূপ করিয়াছে, সেই সুরেশের কথায় অচলা পর মুহূর্ত্তে বিশ্বাস করিয়া ফেলিল। এটা অবচেতন মনের ক্রিয়া বলিয়া স্বীকার না করিয়া এইটুকু বলিতে প্রয়াস পাই যে, শরৎচন্দ্র নারীর ঈর্ষ্যা-পরায়ণতা ও সহজ-বিশ্বাস-পরায়ণতা লইয়া কৌতুক করিতেছেন। কেননা সুরেশের উপর অচলার বিশ্বাস ও প্রণয়ের পাণ্টা টান মহিমের মধ্যে মৃণালকে কেন্দ্র করিয়াই নয় কি? তারপর সুরেশের অসুস্থাবস্থায় অচলা তাহাকে সেবা দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে পারে, পাছে বিদেশে তাহার কলঙ্ক প্রকাশ হইয়া পড়ে—এই জন্য সে সব কথা লুকাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে-অচলা একদিন মনে মনে ভাবিয়াছিল, 'যাহাকে সে কোন দিন ভালবাসে নাই, সেই তাহার প্রাণাধিক—শুধু এই মিথ্যাটাই সবাই জানিয়া রাখিল! আর যাহা সত্য, সে কি কোথাও কাহারও কাছেই আশ্রয় পাইল না?' সেই অচলার পক্ষে,

যে-দিন সুরেশ তাহাকে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল, সে-দিনও লজ্জা বা অপমান বোধ আসে নাই। না আসিবারই কথা। শিক্ষা ও সংযম কিছু উৎকট রকমের না হইলে এই রকম হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ইহার পরে অচলা যে সুরেশের সহিত দেহের মিলনে আপত্তি করিবে না ইহা স্বাভাবিক, কারণ চুম্বনে যে স্বীকৃতি যৌবনের অঙ্গাঙ্গী মিলনেও সেই স্বীকৃতি। তবুও শরৎচন্দ্র, যেমন 'চরিত্রহীনে' দিবাকর ও কিরণময়ী একই শয্যায় শয়ন করিলেও তাহাদের মিলন হয় নাই বলিয়া কৈফিয়ৎ কাটিয়াছেন, এখানেও হয়ত সেইভাবে অস্বীকার করিতে পারেন। এই চুম্বন বর্ষণের পর অচলা ভাবিয়াছে—'অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যাহা ফাঁকি, ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবার পথেই কোন-বাধাই ছিল না। এই সুরেশই তাহার স্বামী হইতে পারিত এবং কোন এক ভবিষ্যতে ইহা একেবারেই অসম্ভব—এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।' চুম্বনে যে বাধা দেয় নাই বরং উপভোগই করিয়াছে তাহার পক্ষে একথা মনে করা আশ্চর্য্যের নহে।

অচলা মহিমকে অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিল। তাহাকে হারাইয়া তাহার অভাব চরম অনুভব করিয়াছিল, সেবার মধ্য দিয়া তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া যথাস্থানে আবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সুরেশের সান্নিধ্যে সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত, কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া অচলার হৃদয় হইতে মহিম সরিয়া গিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সুরেশ বাহির হইতে আসিয়া হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যেমনই সোজা তেমনই জটিল। যদি শিক্ষা ও সংযম মনের ভিতর দৃঢ়ভাবে ভিত্তিলাভ না করে তবে সচেতন মন ও অচেতন মনের সংঘর্ষ এই রকমই হয়। যে সুরেশকে অচলা কোন দিন ভালবাসে নাই বলিয়া মনে

করিয়াছে সেই সুরেশের সহিত সে ঘর-সংসার করিবার সুখের মায়াজাল বুনিয়াছে। যাহাকে সে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া দূর করিয়া দিয়াছে তাহাকেই নিয়তির চক্রে তথা অবচেতন মনের ঘুর্ণীবায়ুতে এক সময়ে স্বামী বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। আবার তাহাকেই তাহার দেহদান করিয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে। "আজ জীবনের এই চরম মুহূর্ত্তে অভিমান ও মোহই তাহার বিশ্বজয়ী হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিল না—নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।" আর তাহারই নিঃসঙ্গতার কথা মনের মধ্যে অনুভব করিয়া সে আপনাকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিয়াছে। "সুরেশ নাই—সে একা, এই একাকিত্ব যে কত বৃহৎ, কিরূপ অকূল তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় (?) যে তরণী বাহিয়া সে সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়াছে, সে যে অনিবার্য্য মৃত্যুর মধ্যে তিল তিল করিয়া ডুবিতেছে, ইহা তাহার চেয়ে বেশী কেহ জানে না। তথাপি সেই সুপরিচিত ভয়ঙ্কর আশ্রয় ছাড়িয়া আজ সে দিক-চিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসিতেছে ইহা কল্পনা করিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল।" অথচ যে-মহিমকে একদিন ভাল-বাসিয়াছিল বলিয়া সুরেশকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেই মহিমকে সে আজ দেখিতে পাইতেছে না। আবার সুরেশের মৃত্যুর পর অচলা মহিমকে বলিতেছে—"তুমি যা হুকুম করবে, আমি তাই কোরব," "তুমি ছাড়া আর (এই আর কথাটা লক্ষণীয়, কারণ এতদিন সুরেশ ছিল) আমার যে কেউ নাই—কেউ যে আমার সঙ্গে কথা কবে না।" "তোমাকে হারিয়ে পর্য্যন্ত ভগবানকে আমি কত জানাচ্ছি, হে ঈশ্বর, আমি আর পারিনে—আমাকে তুমি নাও! কিন্তু তিনিও শুনলেন না, তুমিও শুনতে চাও না! আমি আর কি করব।" এইখানে, দুর্নীতি-

পরায়ণা নারী যে কতখানি হীনভাবে ছলনাময়ী হইতে পারে, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। নারী এমন ভাবে মায়াবী হইতে পারে বলিয়াই সে তাহার নিজের হৃদয়ের গোপন তলের কথা আপনাকেই বুঝাইতে পারে না, কেবল ছলনার আশ্রয়ের দিকে ছুটিয়া চলে। আর এই ছলনা-জীবন, ভণ্ডামী বা বাক্-চাতুর্য্যে কিস্তিমাৎ করিবার ফন্দি-ফিকির তথাকথিত আলোক-প্রাপ্ত, শিক্ষাপ্রধান বা স্বাধীন, সংযমহীন, অগভীর, একঘেয়েমি-ক্লান্ত বা রকমফের-আসক্ত, বিশিষ্টপর্য্যায়ভুক্ত জীবনে যত বেশী দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নহে।

অচলা-চরিত্রের সবটাই তাহার হৃদয়ের দ্বন্দ্বের বিকাশ নহে। হৃদয়ের দ্বন্দ্ব যতটা, বাহিরের ঝড়টা বা শরৎচন্দ্রের উস্কার মত অনুষ্ঠান·উপকরণের যোগানটা ততোধিক। তবে অচলার ছলনা একটু মোলায়েম ভাবেই প্রকট হইয়াছে। অচলার স্বামী কে? এক পক্ষে মহিম বটে, অন্যপক্ষে সুরেশও বটে। অচলাকে সত্যই বলা যায় দ্বিচারিণী। কারণ মহিমই যে তাহার প্রকৃত স্বামী ইহা অচলার নিজের কাছেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজেই সুরেশের সহিত তাহার যে মিলন তাহাকে ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। শরৎচন্দ্র ছলনা ও খেয়ালের যে চিত্রই অঙ্কিত করুন না কেন, তিনি ব্যভিচারের যে চিত্র দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের মঙ্গলময় ক্ষেত্রে জোরপূর্ব্বক নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতীব গর্হিত ও নিন্দনীয়। সুরেশ ও অচলার চুম্বন ও মিলন দেখাইয়া তিনি কলা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে নিপুণতাই দেখাইতে সমর্থ হউন না কেন তাহা অকল্যাণকেই ডাকিয়া আনে, অতএব তাহা দূষ্য ও পরিবর্জ্জনীয়। শরৎচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন, "আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাই আমার সাহিত্যের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না

হইলে দিতে পারি না।” কিন্তু যখন তিনি নিতান্ত বাধ্য না হইয়াও চুম্বন ও দেহের মিলন ঘটাইয়াছেন তখন তাঁহারও মধ্যে যে ছলনা বা চাতুরী কতখানি তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না। কেন তিনি এই পথের পথিক হইতে পারেন তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ‘গৃহদাহ’ বাস্তব ঘটনার চিত্র যতটা না হইয়াছে, বাস্তব চিত্র ঘটাইবার পরোক্ষ কারণ (Remote cause) হইয়াছে ততোধিক। ‘চরিত্রহীন’ লিখিবার পর শরৎচন্দ্রের অবস্থা যেরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল তাহা তৎপরকাল-রচিত কয়েকখানি পুস্তক দ্বারা এক রকম কাটাইয়া লইয়াছিলেন। তারপর ‘গৃহদাহ’ চালাইয়া দিলেন। ‘দেবদাসে’ই তাঁহার এ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তখনও তিনি সমাজের সুধী ও প্রজ্ঞদিগকে খুসী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ‘গৃহদাহ’, ‘চরিত্রহীন’, ‘শ্রীকান্তে’র কোন কোন স্থান ও পরিশেষে ‘শেষ-প্রশ্নে’ কমলের ওকালতিতে তিনি যৌবনের অতি আধুনিক (ultra-modern) অভিযানকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন কিম্বা তাহারই সূত্রপাত করিলেন। সেইজন্যই আমরা বলিতে বাধ্য হই, “যা দ্বয়লোক-সাধনী সা চাতুরী সা চাতুরী।” শরৎচন্দ্রের মধ্যেও great man এবং weak man লক্ষ্যীভূত হয়; কারণ তাঁহার শিল্পসৃষ্টির মধ্যে মহামনার উচ্চস্তরের মানসিক অবস্থার পরিচয় ও হীনমনার নিম্ন পর্য্যায়ের মানসিক অবস্থা বা উচ্চস্তরের মানসিক অবস্থার অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।*

---

* Great art is the expression of the mind of a great man and mean art is that of the want of mind of a weak man.

—Ruskin.

এতক্ষণ আমরা শরৎ-সাহিত্যে নারীর যে প্রেমের আলোচনা করিয়াছি তাহার সূচনা কুমারী অবস্থায় হইয়াছিল, পরে সেই প্রেম কি ভাবে বিকাশ লাভ করে এবং বিবাহিত জীবনেই বা তাহার কিরূপ স্বরূপ প্রকাশ পায় তাহারও আলোচনা করা হইয়াছে। এখন আমরা বিবাহিত জীবনের প্রেমের কথাই আলোচনা করিব।

মিলন ছাড়াও ভালবাসার কথা ভাবিতে পারা যায় এবং আমরা দেখিয়াছি এইখানেই প্রকৃত ভালবাসা। এই ভালবাসা যদিচ লোকচক্ষে বা দেহের মিলনের দিক্ দিয়া অমিলনাত্মকই থাকিয়া যায় তথাপি ইহাকে মনের মিলে মিলনাত্মক বলিলে ক্ষতি নাই। ইহা বিবাহিত জীবনের নিত্যকার ভালবাসায় পুষ্ট হয় না, কামনা-ক্লিষ্ট হয় না, কারণ এইখানেই দৈহিক বিচ্ছেদের অমিলনাত্মক ধ্যান-মগ্নতা, আর শরীরগত অপূর্ণ মিলনের নিত্য আকর্ষণ থাকে। এই ভালবাসা কামনা দ্বারাই পুষ্ট হয়, কিন্তু স্বার্থ, অভিসন্ধি, ছলনা ও চাতুর্য্যের দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না। সেইজন্য এই কামনায় বিশেষ রকম সংযম ও সীমারেখা থাকিয়া যায়। রমা-চরিত্রে সে গণ্ডীরেখা কিছু উৎকট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রমা একজন তথাকথিত সমাজপতি, এবং ইহা তথাকথিত সমাজেই স্বাভাবিক। দেবদাসের প্রতি পার্ব্বতীর প্রেম উন্নত জীবনের পরিচয় প্রদান করে। উন্নত কে? না, যাহার সহনশীলতা অতুলনীয়, যাহার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক। পার্ব্বতীরই আবার অপরের দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি সমধিক। তাহার উন্নত জীবনের ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়। সে ব্যর্থ প্রেমে জীবন লোপের প্রয়াস না পাইয়া জীবন বর্দ্ধনের সুযোগ সর্ব্বত্র ও সকল সময় অন্বেষণ করিয়াছে। পার্ব্বতী বঞ্চিত, ক্ষুধিত। সেইজন্য সে ক্ষুধার তাড়নে সংযম ও সমাজের মধ্যে যেমন বিশ্বমৈত্রী সুধা অর্জ্জন করিয়াছে তেমনিই সেই সুধা সে চারিদিকে অকাতরে দান

করিয়া চলিয়াছে। 'চরিত্রহীনে' সাবিত্রীর প্রেমে অশ্লীলতা নাই, কারণ সাবিত্রী সংযমচ্যুত হয় নাই। কিরণময়ীর প্রেম অকথ্য। উভয় ক্ষেত্রেই সেই একই যৌন আকর্ষণ বিদ্যমান বটে, কিন্তু কিরণময়ীর অসংযম নিম্নপর্য্যায়ের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক। আমাদের তথা শরৎচন্দ্রেরও তাহা সর্ব্বাংশে উপেক্ষা করা উচিত। এই প্রকার চিত্রাঙ্কন তাঁহার মত লেখকের পক্ষে অশোভনীয়। আশা করি তিনি এই জাতীয় চিত্রাঙ্কন লুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন। আমরা শুধু বাহিরটাই দেখিতে শিখিয়াছি, মোটামুটি পাওয়ার কথাটাই বড় করিয়া তুলি। কৃতী লোকের নজর—সে যেন না কিছু হারায়। ভালবাসার পন্থা তেমন হিসাবের নয়। ভালবাসা শুধু আসক্তি নয়, সে শুধু পাওয়ার কথা ভাবে না। তার এক-মাত্র রূপ সে দীনাকে, বঞ্চিতাকে, কুৎসিত আঁধার তলের ন্যায্য পর্য্যায়ের মানুষকেও মহীয়ান্ করিয়া তুলে। ভালবাসার প্রকৃত উদ্দেশ্য জীবন বর্দ্ধনের দিকে, কারণ কোন প্রকারেই ইহার অন্যথা কল্পনা করা যায় না।

'বড়দিদি' গল্পে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিধবা মাধবীর আসক্তি জাগিয়াছিল। প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর দয়ার ভাবটাই স্ফুট ছিল। পরে সেই দয়ার ভাবটাই প্রেমে পরিণত হয়। দয়া করিতে গিয়া যে প্রেমের সঞ্চার হয় না এমন নহে।* সুরেন্দ্রনাথের বৃদ্ধের ন্যায় বৈরাগ্য, বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা মাধবীর নিকট রহস্যময় বোধ হইত এবং এইজন্যই সুরেন্দ্রনাথের উপর তাহার খানিকটা করুণাও আসিয়া পড়িয়াছিল। দয়া কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা করে—এটা খুব অস্বাভাবিক নহে। মাধবীও সুরেন্দ্র-নাথের নিকট হইতে এইরূপ কিছু আশা করিত। সে সুরেন্দ্র-নাথকে চশমা কিনিয়া দিয়াছিল—তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ আনন্দ বা

* Pity melts the mind to love.—Shakespeare.

কৃতজ্ঞতা কিছুই প্রকাশ করে নাই। ইহাতে মাধবীর সদা-প্রফুল্ল মুখ মুহূর্ত্তের জন্য মলিন হইল। মনোরমাকে মাধবী যে পত্র লিখিয়াছিল তাহাতে সুরেন্দ্রের প্রতি তাহার টানটা প্রকাশ পাইয়াছিল। "প্রমীলার জন্য বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন—তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে তাহার একদণ্ডও চলে না—আমার অর্দ্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে—তোমাকে পত্র লিখিব আর কখন?"—৪র্থ পরিচ্ছেদ। মাধবীর মন ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু যখন অপর পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতাও মিলিল না তখন সে সুরেন্দ্রকেই যেন একটু শিক্ষা দিবার জন্য কাশী চলিল। যাইবার সময় সে সংসারের সব বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া গেল। "কিন্তু মাষ্টারের কথা কাহাকেও বলিয়া গেল না। সে ভুলিয়া যায় নাই—ইচ্ছা করিয়াই বলিল না। সম্প্রতি তাহার উপর একটু রাগ হইয়াছিল। মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই। তাই মাধবী বিদেশে গিয়া এই অকর্ম্মণ্য সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে যে, সে একজন ছিল। একটা কৌতুক করিতে দোষ কি? সে না থাকিলে ইহার কেমন ভাবে দিন কাটে দেখিতে হানি কি? তাই সে সুরেন্দ্রের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।"—৪র্থ পরিচ্ছেদ। মাধবী কাশী হইতে ফিরিবার পর সুরেন্দ্র প্রমীলার হাত ধরিয়া মাধবীকে দেখিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে মাধবী বড়ই লজ্জা পাইয়াছে। তাহার আরও সঙ্কোচের কথা এই যে "বিন্দু মাসী নাকি কথাটা লইয়া একটু হাসিয়াছিল।" ইহার পর হইতে সুরেন্দ্রের উপর মাধবীর যত্নটা কমিয়া আসিল। ইহার পর যে-দিন এক রকম তাহারই কথায় সুরেন্দ্র তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে-দিন সে

টের পাইল না—সে কিঁ ভুল করিতেছে এবং তাহার ভ্রান্তির মাত্রা কতখানি। যখন সুরেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল তখন সে হাঁসপাতালে। সুরেন্দ্র মাধবীকে দেখিতে চাহিয়াছিল, মাধবী যায় নাই। ইহাতে হিন্দু বিধবার সংযম দৃষ্ট হয়। মাধবী সুরেন্দ্রকে আপনার অন্তরের অন্তরে দেখিতে লাগিল। কিন্তু তাহার অন্তরের যে আবেগ তাহা একদিন মনোরমার কাছে প্রকাশ পাইয়াছিল। মনোরমার নিকটে সে সুরেনের কথার উল্লেখে কাঁদিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—"তিনি যদি না বাঁচ্‌তেন, তা'হলে বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম।" মাধবীর আরও দুঃখ—সে বিধবা, সে যেমন সুরেন্দ্রকে ভালবাসিত, সুরেন্দ্রও যে তাহাকে ছাড়া আর জানিত না—একথাও সে তেমনি সত্য বলিয়া জানিত। সুরেন্দ্রের হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইবার পর গল্পের যে অংশ তাহাতে মাধবীর স্থান প্রায়ই নাই। শেষে শরৎচন্দ্র যে-ভাবে মাধবী ও সুরেন্দ্রকে মিলাইয়াছেন তাহা করুণ বটে। মাধবী সুরেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিবার ফলে সে গাড়ী চাপা পড়িয়া যে আঘাত পাইয়াছিল সেই আঘাতের স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ হইতেছিল। সন্ধ্যার পর উজ্জ্বল দীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখপানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন শুনিতে না পায়, হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "বড় দিদি, সে-দিনের কথা মনে পড়ে, যে-দিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি। তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, (?) কেমন, শোধ হ'ল ত?" মুহূর্ত্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুন্ঠিত মস্তক সুরেন্দ্রের পার্শ্বে রাখিল, যখন জ্ঞান হইল, তখন বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।" শেষাংশ করুণাত্মক এবং মনের কাছে এই ছাপ দেয় যে, শিল্পীর নিপুণতায় সুরেন্দ্রের প্রাণের অসংজ্ঞাত প্রতিক্রিয়াটি মাধবীকে একান্ত-

ভাবে তখনই কাছে পাইয়াছে যখন লোকচক্ষে তাহা আর নিন্দনীয় নহে। কিন্তু মাধবী আজীবন তাহার অপরাধের স্মৃতি বহিয়া চলিবার জন্য পাইয়াও হারাইয়াছে।

'দর্পচূর্ণ' গল্পে দেখা যায়, ইন্দুমতী নরেন্দ্রকে তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসিয়াছিল। নরেন্দ্রের সাংসারিক অবস্থার দিকে চাহিয়া ইন্দুর মাতাপিতা এই বিবাহে আপত্তি করিলেও কেবল মাত্র শিক্ষিতা কন্যার জিদের বশেই এই বিবাহ সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের ফল যে দুঃখময় হইবে তাহা কেহই আশা করে নাই। ইন্দু শিক্ষিতার তেজস্বিতার অযথা তাপ ও ধনীকন্যার অহঙ্কার লইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল। ইন্দু নরেন্দ্রকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে যে হিন্দু পরিবারের আদর্শানুযায়ী স্বামীর আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে—সে এমন আশা করে নাই। ইন্দু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহার মগজে নারীর অধিকার, নারীর দাবী প্রভৃতি কথাগুলা বোধ হয় একটু বেশী করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। সেইজন্য সে বিমলার কথার উত্তরে সক্রোধে বলিয়াছিল, "(স্বামী পত্নীকে তাড়াইয়া দিলে) ঠেকাবে রাজা, ঠেকাবে আইন।......নিজের মুখে নিজেকে দাসী বল্‌তে লজ্জা হয় না? স্বামী কি মোগল-বাদশা? আর স্ত্রী কি তাঁর ক্রীতদাসী যে, আপনাকে আপনি এমন হীন, এমন তুচ্ছ করে গৌরব বোধ কর্‌ছ?"—১ম পরিচ্ছেদ।

স্বামী যে নারীর কি সম্পদ, সে সম্বন্ধে ইন্দুর ধারণা নাই। সে স্বামীকে ভালবাসিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামীই যে তাহার সব কিছু এবং স্বামীর সত্তার মধ্যে সে যে বিলীন হইয়া থাকিবে—এমন কথা সে ভাবিতে পারে না। সে বলিয়াছিল, 'ঈশ্বর করুন, আমার নারী-মর্য্যাদাকে ডিঙ্গিয়ে যেন কোন দিন আমার ভালবাসা মাথা তুলে উঠ্‌তে

না পারে। যে ভালবাসা আমার স্বাধীন সত্তাকে লঙ্ঘন ক'রে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।" ইন্দু ধনীকন্যা। তাহার স্বামী দরিদ্র হইলেও সে আপনাকে সেই দরিদ্র অবস্থার সহিত মানাইয়া লইতে সমর্থ নহে এবং ইচ্ছুকও নহে। সে দু'হাতে খরচ করিতে থাকিবে, আর তাহার স্বামী যেখান হইতে হউক না কেন শেষ রক্তবিন্দু পাত করিয়া সেই খরচের জন্য অর্থের যোগান দিবেন—এই তাহার অভিপ্রায়। কাজেই ইন্দু তাহার ভালবাসা দিয়া নরেন্দ্রকে যতটা না সুখী করিয়াছে, নিপীড়িত করিয়াছে ততোধিক। দাম্পত্যসুখ যে কি তাহা সে বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারে নাই। নরেন্দ্রকে বিবাহ করিবার পর কিছুদিনের মধ্যে তাহার যেন এই ধারণা জন্মিয়াছে—এই গরীবের ঘরে তাহার বিবাহ না হইলেই বোধ হয়, ভাল হইত। "বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে পড়ার মত মহাপাপ আর সংসারে নাই।" স্বামী দরিদ্র হইলে কি আসে যায়—সে তো বড়লোকের কন্যা—তাহার এ চেতনা টনটনে হইয়া আছে।

ইন্দু কোন দিন ধৈর্য্য শিক্ষা করে নাই। সে অল্প কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠে। সামান্য ব্যাপারেই তাহার রাগ চড়িয়া যায়। স্বামীর পায়ে হাত দিতে গেলে তাহার মাথা কাটা যায়। এমন কি, স্বামীকে সন্তুষ্ট করাটাও তাহার কাজ নয়। টাকার ব্যাপার লইয়াই যেন তাহার স্বামীর সহিত সব সম্বন্ধ। সে যে একদিন ভালবাসিয়া নরেন্দ্রকে বিবাহ করিয়াছিল—একথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। প্রেম, প্রীতির স্বরূপ সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। চোখের নেশায় সে মজিয়াছিল। স্বামীকে হারাইয়া নারীহৃদয়ের যে কতখানি শূন্য হইয়া যায় তাহা স্বামীর নিকট হইতে একবার বিচ্ছিন্ন হইয়াও সে বোধ করিতে পারে নাই। তখনও সে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজের সুখে নিজে ডুবিয়াছিল। সে ধনীর কন্যা

হইয়া জন্মিয়াছে—ইহাই তাহার মত্ততার কারণ। মেদিনীপুর হইতে ফিরিবার পর বিমলার সহিত কথাবার্ত্তায় ইন্দুর মনের এক কোণে যেন একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, সে স্বামীর স্নেহ হইতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইতেছে, সেইজন্য সে আপনার গহনা বিক্রয়া করিয়া স্বামীর বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু তাহার এই ব্যবস্থা আর কার্য্যকরী হয় নাই। প্রথমতঃ নরেন্দ্র তাহার কৃত ব্যবস্থাটাকে বিমলার কৃত কাজ বলিয়া সন্দেহ করায় ইন্দু অন্তরে আঘাত পাইয়াছিল। আবার টাকা-কড়ির প্রশ্ন উঠায় নরেন্দ্র ও ইন্দু উভয়েরই ধৈর্য্যহীনতায় দুইজনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হইয়া গেল। ইন্দু কথা সহিতে, হার মানিতে শিখে নাই। সেই জন্য তাহার ক্রোধ নরেন্দ্রের অপেক্ষা অধিক চড়িয়া গেল। ইন্দুর ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, সে যেন প্রীতি ও ধৈর্য্যের সহিত স্বামীর ঘর করিতে আসে নাই, সে তাহার খেয়াল চরিতার্থ করিতে আর সেই সঙ্গে নরেন্দ্রকে জ্বালাইতে ও পোড়াইতে আসিয়াছে। নরেন্দ্র একখানা বই বিমলার নামে উৎসর্গ করিয়াছিল। ইন্দুর দৃষ্টি সে-দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় সে অভিমান, ক্রোধ ও হিংসায় একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

পত্নী স্বামীর প্রতি যেমন রূঢ় ব্যবহার করিতে সাহস করুক না কেন, স্বামী তাহাকে ভালবাসে না—একথা অপরের নিকট প্রকাশ হইলে কলঙ্কের বোঝা হইবে—ইহা সে মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারে না। ইন্দু তাহার দাদার নিকট চলিয়া গেলে যখন নরেন্দ্র তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল না, তখন এই জিনিষটাই ইন্দুর বেশী করিয়া চোখে পড়িল। যে-দেমাকে সে একদিন নরেন্দ্রকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল সেই দেমাকই আজ তাহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে—সেখানে তাহার স্থান

নাই, অথচ দাদার নিকটে বেশী দিন থাকাও শোভনীয় না হইয়া বরং অশোভনীয় দেখাইতেছে। কাজেই প্রকৃত পক্ষে এখন তাহার কোথাও স্থান নাই। এই অবস্থায় স্বামী যে কি সম্পদ সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে এবং স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে। কিন্তু ইন্দু এমনই প্রকৃতির রমণী যে, সে এখনও নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে চায় না। সে বিমলাকে বলিতেছে—শুধু তার (কমলের) জন্যই আসা, নইলে আস্‌তুম্‌ না। এবার যখন সে সত্যই বিমলার মুখ হইতে শুনিল—স্বামীর নিকটে তাহার আর স্থান নাই তখন ইন্দুর দু' চোখ বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইহার পর ইন্দু ও নরেন্দ্র মিলিত হইল। স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া পত্নীর দর্প করা চলে না। স্বামীর ইচ্ছাকেই আপনার ইচ্ছা, স্বামীর সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়—এই কথাটাই শরৎচন্দ্র এই গল্পের মধ্য দিয়া বলিয়াছেন কি না তাহা আমরা একটু আলোচনা করিতেছি।

এই গল্পে শরৎচন্দ্র বিমলার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, বিমলার অস্তিত্ব তাহার স্বামীর সত্তার সহিত মিশিয়া আছে। সে আপনাকে স্বামীর অংশ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। ইন্দু যা', বিমলা তাহার বিপরীত। সাধারণতঃ দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর উভয়েই সমভাবাপন্ন হইলে সংসার সুখের হয়। কিন্তু যেখানে দুইজন সমভাবাপন্ন নয় সেখানে একজন আর একজনের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠে। ইন্দু ধৈর্য্যশূন্যা, নরেন্দ্র ধৈর্য্যশীল। ইন্দু অভিমানিনী, নরেন্দ্র নিরভিমান। ইন্দুর সহনশীলতা আদৌ নাই, নরেন্দ্রের সহিষ্ণুতা এক কথায় অপরিসীম। একজনের গুণের শূন্যতা আর একজনের গুণের পূর্ণতার নিকট অসম দেখাইলেও ঠিক অসমতার সৃষ্টি করিতে পারে না। কারণ অপরের পূর্ণতা সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিতে চায়। চুম্বক বিভিন্নগুণবিশিষ্ট

লৌহকে আকর্ষণ করে। বৃহৎ তারকা ক্ষুদ্র তারকাকে আকর্ষণ করে। জড় জগতে এই অসমগুণের আকর্ষণ দেখা যায়। এই আকর্ষণই জীব-জগতের প্রেম। সেই জন্য স্বামী ও স্ত্রী বিভিন্নভাবাপন্ন হইলেও প্রেম বিদ্যমান থাকিলে সেখানকার সঙ্গতি অনির্ব্বচনীয় হয়। শরীরতত্ত্বপ্রধান মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের কথায় বলা চলে—বহির্জগতের ছবি ক্যামেরার মত আমাদের দৃষ্টির মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। দৃশ্যপটের সমতা ও অসমতা হেতু ছবির সঙ্গতি ও অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। এই প্রকার দুই বিপরীত বস্তু লইয়াই সংজ্ঞাত মনের কারবার। সংজ্ঞাত মনের মধ্যে নিয়ত এই দুই বিপরীত বস্তুর সংঘর্ষ চলিতেছে। তথাপি বৈপরীত্যের মধ্যেও একটা নিত্য আকর্ষণ আছে, এই ভাবে প্রতিচ্ছবি সংখ্যায় বহু ও জটিল হইয়া উঠে। সংজ্ঞাত মনের পশ্চাতে অসংজ্ঞাত মন বর্ত্তমান থাকে। তাহার প্রচ্ছন্ন শক্তি সংজ্ঞাত মনের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে প্রবল এবং এই অসংজ্ঞাত মনের কোঠায় যে সঙ্গতি রক্ষিত হয় তাহাই যথার্থ সঙ্গতি। বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই প্রকৃত সঙ্গতি সম্ভব। ইন্দুর দর্প চূর্ণ করিতে তাহার অসংজ্ঞাত কামনা বর্ত্তমান ছিল এবং তাহারই নারীহৃদয়ের প্রেম এই পথে পাথেয় যোগাইয়াছিল। তাহার বঞ্চিত নারীহৃদয়ের প্রেম পরিপূর্ণ করিতে স্বামীর সোহাগের পরিবর্ত্তে বঞ্চনা সেখানে উপলক্ষ মাত্র। মোটকথা এখানে spare the rod and spoil the game—এই নীতির ধূয়া তোলা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয় বলা যাইতে পারে।

'নববিধান' উপন্যাসে ঊষার প্রেম স্বামীপ্রেমের এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দাম্পত্যসুখ হিন্দুর যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই আদর্শ ঊষার স্বামীপ্রেমের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। ঊষা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা। সে হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা মানিয়া চলিতে আবাল্য অভ্যস্ত। কিন্তু

তাহার মধ্যে গোঁড়ামি নাই। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শৈলেশের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু শৈলেশ উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত চলিয়া গেলে দেনা-পাওনা লইয়া শৈলেশের পিতা ও ঊষার পিতার মধ্যে মনোমালিন্য হয়, তাহাতে শৈলেশের পিতা ঊষাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন, আর ফিরাইয়া আনেন নাই। শৈলেশ বিলাত হইতে ফিরিয়া পিতার আদেশানুসারে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর মৃত্যু হইলে শৈলেশ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঊষাকে আপনার আলয়ে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করে।

ঊষা যখন পুনরায় আপনার স্বামীর আলয়ে ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল, তাহার মধ্যে ক্রোধ নাই, বিরক্তি নাই, অভিমান নাই। মনে হয়, সে যেন তাহার নিজের সংসার, নিজের স্বামীপুত্রের নিকট হইতে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র গিয়াছিল, আবার ফিরিয়া আসিয়া অগোছাল সংসারের তত্ত্বাবধান করিতেছে। স্বামীই ঊষার ধ্যানজ্ঞান, স্বামীর সুখেই তাহার সুখ—কিন্তু সে ধ্যানজ্ঞান, সে সুখ শৃঙ্খলাবদ্ধ। ঊষা হিন্দুর আচার-নিষ্ঠা মানিয়া চলে, সংসারের মধ্যে সেই ভাব চালাইতে চায়—কিন্তু কোন দিক্ দিয়া তাহা স্বামীর অসুখের কারণ হয়, স্বামীর অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে ঊষা তাহা পছন্দ করে না। সে আপনি যাহা মানিয়া চলে, আপনি যাহা ভাল মনে করে, অন্যে তাহা না মানিলে, অন্যে তাহাকে মিথ্যা বলিলে তাহাতে তাহার কোন অভিযোগ নাই। ঊষা স্বামীর আলয়ে আসিয়া স্বামীকে অর্থের দিক্ দিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকে আপনার যত্ন-সেবা দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সে আপনার জপ-তপ, আচার-নিষ্ঠা দ্বারা স্বামীকে উত্যক্ত করিতে চায় না। সে স্বামীকে যথার্থ ই সুখী করিতে চায়। কিন্তু তাহার কল্পিত সুখের রূপটা যে আর কাহাকেও তীব্র পীড়া দিতে পারে তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই।

শৈলেশ বিলাত-ফেরত। তাহাকে বিলাতী সমাজের সহিত মিলা-মিশা করিতে হইবে, নতুবা তাহার মান-সম্ভ্রম থাকিবে না—তাহার ভগিনী বিভার ইত্যাকার কথাগুলা তাহার কাণে মন্ত্রের মত কাজ করিল। শৈলেশ দুর্ব্বল প্রকৃতির। সে বিভার কথাগুলা আপনার মগজে স্থান দিয়া ঊষাকে ভুল বুঝিয়া বসিল। সে দুর্ব্বল প্রকৃতির না হইলে টেবিল বাদ দিয়া মেজেতে বসিয়া খাওয়া, বাবুর্চ্চির রান্নার পরিবর্ত্তে স্ত্রীর হাতের রান্না খাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারগুলা অনভ্যস্ত হইলেও যেমন সহিয়া যাইতেছিল তেমনই সহিয়া যাইত।

ঊষা বুঝিয়াছে, তাহার আচার-ব্যবহার তাহার স্বামীর কোন প্রকারে সহিলেও বিভার কিছুতেই সহিবে না, এবং এই লইয়া স্বামীর ভাই-ভগিনীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায় ইহা সে চায় না। অথচ সে হিন্দুয়ানী ছাড়িতে পারে না। সে নিজে হিন্দুয়ানী না ছাড়িলেও স্বামীর সুখের জন্য সে আধুনিক ব্যবস্থা অর্থাৎ টেবিলে খাওয়া, বাবুর্চ্চির রান্না প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার ব্যবহার কোন প্রকারেই বিভার প্রীতিকর হইবে না—সে ইহা ভালভাবেই বুঝিয়াছে। সে আপনার দিক্ হইতে স্বামীকে মুক্তি দিতে চায়। এইজন্য সে দাদার বাড়ীতে চলিয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছে। ইহা ঊষার অভিমান নহে, এই চলিয়া যাওয়ার পশ্চাতে তাহার স্বামীকে স্বামীর ধারণানুযায়ী সুখী করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে।

ঊষা স্বামীর আলয় হইতে দ্বিতীয় বার চলিয়া গেলেও সে স্বামীর সমস্ত খোঁজ-খবর রাখিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঊষার মধ্যে মিথ্যা গোঁড়ামি ছিল না। সে যখন জানিয়াছে তাহার দুর্ব্বল-প্রকৃতি স্বামীকে কয়েকজন সন্ন্যাসী মিলিয়া নাচাইতেছে, তখন সে আর আপনাকে দূরে রাখিতে সমর্থ হয় নাই। সে স্বামীকে আর একবার রক্ষা করিবার জন্য

ছুটিয়া আসিয়াছে। ঊষা সরলা, নিরভিমানা। সে আপনার অন্তরেই স্বামীকে চায়, কিন্তু কোন কারণে তাহার অসন্তোষভাজন হইতে চায় না, তদপেক্ষা সে আপনাকে দূরে রাখিয়া সেই দূর হইতে স্বামীর উদ্দেশ্যে আপনার প্রেমপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে চায়। স্বামীপ্রেমের এ এক নবীন চিত্র।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে স্বামীপ্রেমের আর এক চিত্র দৃষ্ট হয়। জীবানন্দের সহিত অলকার বিবাহ হইবার পর দীর্ঘকাল আর উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ নাই। তারপর জীবানন্দের শান্তিকুঞ্জে দেখা হয়। জীবানন্দের লোকজন ষোড়শীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য তাহাকে এক প্রকার ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে। যতক্ষণ ষোড়শী জীবানন্দকে চিনিতে পারে নাই ততক্ষণ সে আপনার মান, সম্মান, গৌরব, সতীত্ব বজায় করিবার জন্য জমিদারের নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়াছে। জমিদারের কুমতলবের উল্লেখে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে-রাত্রিতে সে শান্তিকুঞ্জে আবদ্ধ থাকিলে পরদিন তাহার অবস্থা কি প্রকার বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইবে —সে সেই কথা ভাবিয়া আকুল হইয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে জীবানন্দকে আপনার বিবাহিত স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সুপ্ত নারীত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে, আর তাহার মান-সম্মানের কথা, গৌরবের কাহিনী চলিয়া গিয়াছে। জীবানন্দকে রক্ষা করিবার অনুরোধের উত্তরে সে কেবল অভ্যাসানুযায়ী তাহার আপত্তি জানাইয়াছে। আপত্তিটা আবার দৃঢ়তাব্যঞ্জক নহে, প্রশ্নসূচক নহে। "এর (অর্থাৎ আমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি—একথা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বলার) পরেও কি আমার জমিতে, টাকাকড়িতে প্রয়োজন থাকৃতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?" স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য ষোড়শী ভৈরবী হইয়াও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মিথ্যা কথা বলিল, যে, সে

স্বেচ্ছায় তাহার নিজের প্রয়োজনে জমিদারের নিকট আসিয়াছে। শরৎচন্দ্র এখানে বলিতে চান যে, স্বামীই নারীর ইহকাল ও পরকাল, স্বামী ছাড়া নারী শূন্য—হিন্দুর এই বোধের নিকট নারীর অন্য সর্ব্ব রকম সম্মান, গৌরব, সাধনা ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া যায়। পত্নী সজ্ঞানে স্বামীর অমঙ্গল সাধন করিতে পারে না। স্বামীকে রক্ষা করা, স্বামীর দুঃখ-সুখের অংশভাক্ হওয়া, পতিব্রতা হওয়া যেমন গৌরবের বস্তু, তেমনি সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মসাধনা করা, দেবতার অর্চ্চনা করা এ সবই ত গৌরবের সামগ্রী। তবে ইহাদের নিকট প্রথমটাই বা এমন জাঁক করিয়া দাঁড়াইল কি জন্য? প্রথমটার সহিত নারীত্ব বোধটাও মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে গৌরব, সংস্কার সবই ম্লান হইয়া গেল। সেইজন্য ষোড়শী জমিদারের নিকট স্বেচ্ছায় আসিয়াছে বলিয়া সমস্ত কলঙ্কের বোঝা আপনার মাথায় তুলিয়া লইল, এবং জীবানন্দের পায়ে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিল। স্বামী দুশ্চরিত্র হউক, মাতাল হউক, তাহাকে সে ত্যাগ করিবে না।

ষোড়শী স্বামীকে চিনিয়াছে—ইহা তাহার অন্তরের কথা। এ কথা বাহিরে কেহ জানে না। বাহিরে সে সন্ন্যাসিনী। এতদিন সে যে-সাধনা করিয়া আসিয়াছে তাহা সে একেবারে ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিবে কিনা তাহাই সে এখন চিন্তা করিতেছে। তাহার মন যেন তাহাকে বলিয়া দিতেছে, "তুমি সন্ন্যাসিনী, এই সকল কথার বড় কথাটা আজ তোমার মনে রাখিতেই হইবে। জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্, ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, একদিন যে তোমার এই দেহটা দেবতার কাজে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, এই সকল সত্যের বড় সত্যটা আজ তোমার অস্বীকার করিলে কিছুতেই চলিবে না। তোমাকে পণ রাখিয়া মিথ্যার বাজি যাহারা খেলিতেছিল, মরুক না তাহারা মারামারি, কাটাকাটি করিয়া,

তুমি এইবার মুক্তি লইযা বাঁচ।”—৭ম পরিচ্ছদ। এতদিন সে ভৈরবীর জীবন কাটাইয়াছে। ভৈরবীর জীবনের দায়িত্ব, সম্পদ, বিপদ, কর্তৃত্ব লইয়া তাহার প্রায় বিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই জীবন ব্যতীত তাহারই মধ্যে যে আর একটা সত্তা গুপ্ত আছে সে তাহার আস্বাদ পায় নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহাকে বহু প্রকার লোকের সহিত মিলা-মিশা করিতে হইয়াছে, কত সুখ-দুঃখের ছবি তাহার চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু মনে পড়ে নাই নারীহৃদয়ের শূন্যতা-বেদনার অসঙ্গতিময় কোন ছাপ সেখানে পড়িয়াছে কিনা। এতদিন সে যে-জীবন যাপন করিয়াছে তাহা অনুশীলনের দ্বারা প্রাপ্ত। কিন্তু অন্তর-রাজ্যে এই অনুশীলন ছলনারই নামান্তর।

ষোড়শীর নারীত্ববোধ জাগরিত হইবার পর যখন সে সন্ন্যাসী-জীবন কাটাইবার কথা চিন্তা করিতেছিল তখন আর একটা বাহিরের জিনিষ আসিয়া তাহার হৃদয়ের দ্বন্দ্বটাকে আরও একটু ঘনীভূত করিয়া দিল। হৈম ও নির্ম্মলের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছে। তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের চিত্রটাও তাহার মনের উপর কিছুমাত্র ছাপ না কাটিয়া চলিয়া যায় নাই। ভৈরবী-জীবনের বাহিরে সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখের দিকে সে এখন আকৃষ্ট হইয়াছে। যদিও “নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোন দিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সেই মনের মাঝখানে গৃহিনীপনার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্ত্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কাজ তাহারই মত নিখুঁত করিয়া করিতে পারে—এই কথাই তাহার মনে হইল।”—১২শ পরিচ্ছেদ। তাহার মধ্যে আজ দুই শক্তির সংঘর্ষ

বাধিয়াছে। অনুশীলনের দ্বারা অর্জ্জিত ভৈরবী-জীবনের গৌরবময় শক্তি, আর এক নারীত্ববোধ ও সাংসারিক জীবনের দুঃখসুখের ভিতর দিয়া নরনারীর মধ্যে প্রচণ্ড আকর্ষণের শক্তি। যে মুহূর্ত্তে সে সাংসারিক জীবনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে সেই মুহূর্ত্তে সে ভৈরবী-জীবনের গৌরব সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তাহার এই সম্ভ্রমবোধটুকুই এখন প্রবল হইয়াছে এবং প্রধান সম্বল বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। দেশ-বিদেশের সকলেই ভৈরবীকে 'মা' বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে দেবী চণ্ডীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। ষোড়শী গৌরবময় 'মা' আহ্বানের লোভ ও আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের সম্ভ্রমের আকর্ষণ দূরে সরাইয়া দিতে পারিতেছে না। "হৈম ও তাহার স্বামীকে মনে পড়িলেই মন যেন তাহার কেমন বিবশ হইয়া আসিত। ইহাদের শৃঙ্খলিত জীবন-যাত্রার ধারার সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় নাই, তবুও কেমন করিয়া যে স্বপ্ন রচিয়া উঠিত, কেমন করিয়া যে কাজের চিন্তা তাহার এলোমেলো কল্পনায় পর্য্যবসিত হইত, কখনো হৈম, কখনো নির্ম্মলের সূত্র ধরিয়া কি করিয়া যে ইহাই এক সময়ে সমস্ত সংযমের বেড়া ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ লজ্জায় ফাটিয়া পড়িত তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পাইত না। অথচ নিজের মনের এই মোহাবিষ্ট লক্ষ্যহীন গতিকে সে চিনিত, ভয় করিত, লজ্জা করিত এবং সকল শক্তি দিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিত।" ষোড়শী যে তাহার স্বামী জীবানন্দ, জনার্দ্দন রায়, শিরোমণি ঠাকুর প্রভৃতির দ্বারা উত্যক্ত ও নিপীড়িত হইতেছে তাহা সে পত্রে হৈমকে জানাইয়াছিল। তাহার এই নিপীড়নের সময়ে হৈমই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে—এ কথা বোধ হয় তাহার অজ্ঞাত মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দেওয়ার পর তাহার ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার নির্য্যাতনের কাহিনীটুকু কেহ ভুল বুঝিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়া

উপস্থিত হয়। সে "মনে মনে দৃঢ়বলে বলিল—কিসের জন্য হৈমদের এত কথা বলিতে গেলাম। কোন্ সাহায্য তাহাদের কাছে আমি ভিক্ষা করিয়া লইব? দেবীর ভৈরবী পদের মধ্যে কি আছে যে, এমন করিয়া আঁকড়াইয়া থাকিব? যে কেহ নিক্ না, কি আমার আসিয়া যায়? ইহারা সবাই ত চোর ডাকাত।"—১৭শ পরিচ্ছেদ। দুই বিভিন্ন বস্তুর আকর্ষণের দ্বন্দ্ব ষোড়শীর মনের মধ্যে খেলা করিতেছে। সে কোন দিক্ দিয়া আপনাকে স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহার চিন্তাসূত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়, সে সাংসারিক জীবন একান্তভাবে গ্রহণ করিবে—এমন চিন্তা তাহার মধ্যে দৃঢ়ভাবে বাসা না বাঁধিলেও সে যে ভৈরবী-জীবন এক সময়ে ত্যাগ করিবে এই কথাই অধিক প্রতীত হয়। যে-দেহটাকে সে দেবতার সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিল সেই দেহটাই এখন তাহার নিজের বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হইয়াছে। এইখানে তাহার অন্তরের পীড়ন। সে দেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য এতদিনের সংযম, সাধনা, গৌরব প্রভৃতিকে একেবারে পদদলিত করিতে পারে না। অন্তরে সে যাহা নয় তাহাই সাজিয়া দেবতার সহিত কপট খেলা খেলিতে কুণ্ঠাবোধ করে। এই দুই সমস্যার মধ্যবর্ত্তী একটা পন্থা তাহাকে যে কোন প্রকারে বাছিয়া লইতে হইবে—যাহাতে সে অন্ততঃ আত্মবঞ্চনার হাত হইতে রক্ষা পায়।

ষোড়শী জীবানন্দকে তাহার স্বামী বলিয়া চিনিয়াছে এবং এই চিনিতে পারার সময় হইতে তাহার মধ্যে সাংসারিক জীবন ও ভৈরবী-জীবনের আকর্ষণের সংঘর্ষ বাধিয়াছে। কিন্তু যদি কোন দিন তাহার পক্ষে ভৈরবী-জীবন ত্যাগ করাও বা সম্ভব হয়, সে-দিন জীবানন্দ তাহাকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা সে-বিষয়ে তাহার সন্দেহ আছে। কিন্তু এই জীবানন্দই আবার তাহার চরিত্রের সম্বন্ধে

কোন কারণে সংশয়াপন্ন হয় তাহাও তাহার অসহ্য। যে-দিন জীবানন্দ গোপনে ষোড়শীর কুটীরে আসিয়া আহারাদি করিয়াছিল এবং ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল, "যত্ন জিনিষটার মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো," সে-দিন ষোড়শীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভৈরবী-জীবনে ষোড়শীর কলঙ্ক ছিল না। তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলেও, সে ইচ্ছা করিয়া জীবানন্দের শান্তিকুঞ্জে আসিয়াছিল এবং আপনার দরকার-বোধে সেখানে সে-রাত্রি কাটাইয়াছিল বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকৃতি দেওয়ায় তাহার কলঙ্কের কথা বাহিরে রটিবার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু ষোড়শী এই কলঙ্কের বোঝা বহন করিয়া চলিতে পারিয়াছে, কারণ জীবানন্দই তাহার স্বামী। তথাপি তাহারও কলঙ্কের ভয় আছে। হৈমকে লিখিত ষোড়শীর পত্র দর্শনই জীবানন্দের ষোড়শীর চরিত্রের উপর সন্দিগ্ধ হওয়ার কারণ। ষোড়শী জীবানন্দের ইঙ্গিত বুঝিয়াছিল। সেইজন্য ষোড়শী, হৈমর সংসার-যাত্রার যে সুখময় চিত্রটা মনের মধ্যে কল্পনা করিয়াছিল সেই চিত্রটাও মুহূর্ত্ত পরে কলঙ্কলিপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল, জীবানন্দ করিতে না পারে এমন দুষ্কার্য্য নাই। এই জীবানন্দই যে তাহার কলঙ্ক ছড়াইতে থাকিবে এই আশঙ্কাটাই সে বেশী করিত। "এই যে পাপিষ্ঠ তাহারই ঘরে বসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছে, যাহার কুকার্য্যের অবধি নাই, যে মিথ্যার জাল বুনিয়া অপরিচিত নিরপরাধ একজন রমণীর সর্ব্বনাশ করিতে কোন কুণ্ঠাই মানিবে না, ষোড়শীর মনে হইল, এ জীবনে এত বড় ঘৃণা সে আর কখনো কাহাকেও করে নাই, এবং এ বিষ যে-হৃদয় মথিত করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত গর্ভতল সেই দহনে যেন অনলকুণ্ডের

ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।” কলঙ্কের সংসারের সব কিছুর উপরেই সে আজ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেবমন্দির, অসহায় প্রজাদের দুঃখ এ সব আর তাহার ভাল লাগিতেছে না। এ সব বন্ধন হইতে সে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলে হয়ত সুস্থবোধ করিত। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সে আজ কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাইতেছে না। তাহার কেবলই মনে হইতেছে—হৈমর স্বামী নির্ম্মল মন্দিরের গোলমাল-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিতে না আসিলেই যেন ভাল হয়।

নির্ম্মল ষোড়শীর কুটীরে আসিল। নির্ম্মলের সহিত ষোড়শীর যে-ভাবে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, এতদিন ভৈরবীর শুষ্ক, রুক্ষ, কঠোর আবরণের পশ্চাতে যে নারী সুপ্ত ছিল সে আজ স্নিগ্ধ-সরসভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সে চঞ্চল, সে ছলনাময়ী, সে কৌতুকময়ী, সে রহস্য-প্রিয়। ষোড়শী অন্তরের দিক্ দিয়া ধীরে ধীরে ভৈরবী-জীবন হইতে সরিয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বার, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা তাহার আর ভাল লাগিতেছে না। অথচ সে অভ্যাসানুযায়ী ভৈরবী-জীবনটাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিতেছে না। যে-দিন সে জীবানন্দকে চিনিয়াছে এবং কাচ কুড়াইয়া লইয়াছে সেইদিন তাহার প্রকৃত ভৈরবী-জীবন লুপ্ত হইয়া মাত্র একটা বাহ্য ঠাটে পরিণত হইয়াছে, এবং মাত্র একটা অভ্যাসগত জীবন-ধারার মধ্যে আসিয়া সুপ্ত নারী-হৃদয়ের প্রাণস্রোতে পাক খাইয়াছে।

এখন ষোড়শীর মধ্যে যে দুই বস্তুর সংঘর্ষ দেখা যায়, তাহার একটা বস্তু নিজের অন্তরের, আর একটা অনুশীলনগত ও বাহিরের। ভৈরবী-জীবনের অনুশীলন অপেক্ষা নারী-জীবনের আর মাতৃ-হৃদয়ের সাংসারিক আকর্ষণটাই আজ তাহার অন্তরে প্রবল। হৈম ও নির্ম্মলের দাম্পত্য-জীবনের ছবিটাই তাহার সুখময় কল্পনার আশ্রয়। ষোড়শী নির্ম্মলকে

জিজ্ঞাসা করিতেছে, ছেলে কেমন আছে, নির্ম্মলবাবু? কি ক'রে তাকে ছেড়ে এলেন বলুন ত? আমি ত পারিনে।" নির্ম্মলের প্রসঙ্গে কথায় কথায় ষোড়শী জীবানন্দকে বলিয়াছে, "আমার যা কিছু কল্পনা, যত কিছু আনন্দের ভাবনা, সে তো কেবল তাঁদের নিয়েই। তাঁদের দেখেই ত আমি সে ষোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডী গড়ের ভৈরবীপদ, যা ভাগ ক'রে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়া-ছিঁড়ির অবধি নেই,—যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্ছি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েছি জানেন? সে ওইখানে। মেয়ে মানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে সে কথা ওঁদের দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি।" এইখানেই মনে হয় ষোড়শীর ভৈরবী-জীবনের সমস্ত বহিরাবরণ একেবারে খসিয়া পড়িয়াছে। তবুও সে বাহিরে ভৈরবী-জীবনের গর্ব্বটুকু ছোট করিয়া ফেলিতে পারিতেছে না বা জীবানন্দকে লইয়া পুরাপুরি সংসার-ধর্ম্ম যাপন করিবার সহজ চেষ্টাও করিতে পারিতেছে না। এই সঙ্কটের মুহূর্ত্তে সে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য চণ্ডীগড় ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু যাইবার সময় জীবানন্দের জন্য তাহার উৎকণ্ঠার অবধি নাই। সে জীবানন্দকে সাবধানে থাকিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ মিনতি জানাইতেছে, কারণ, জীবানন্দের জীবন বিপদাপন্ন হইতে পারে—একথা সে জানে। ষোড়শী চলিয়া গেল। জীবানন্দের জীবন যখন সত্যই সঙ্কটাপন্ন হইল তখন ষোড়শী স্বামীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আবার ফিরিয়া আসিল। এইবার ষোড়শীর হৃদয়ের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে। সে জীবানন্দের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ষোড়শী তাহার স্বামীর সহিত চলিয়া গেল। সমাজ শুধু জানিয়া রাখিল—ষোড়শী ভৈরবী কলঙ্কিনী। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্ব্বের অন্নদার চরিত্রও এই ভাবে পাশাপাশি আসিয়া পড়ে। বিধর্ম্মী সাপুড়িয়াই তাহার স্বামী।

কিন্তু লোকে জানিয়া রাখিল—অন্নদা জাতি-ধর্ম্ম-কুল-ত্যাগিনী অসতী।

'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসে কুসুমের প্রেমের মধ্যে সংঘর্ষ বা ক্রম-বিকাশের তেমন পরিচয় নাই। বৃন্দাবনের সহিত কুসুমের বিবাহ হয়। বৃন্দাবনের পিতা কুসুমের মাতার কি একটা দোষ ধরিয়া কুসুমকে ত্যাগ করে। পরে আর একজন বোষ্টমের (বৈষ্ণবের) সহিত কুসুমের কণ্ঠিবদল না কি এই রকম একটা কিছু হয়। সেও মারা যায়। তারপর হইতে কুসুম পিত্রালয়ে বাস করিতেছে। কুসুমের হৃদয়ের মধ্যে কে বিরাজ করিতেছে তাহার কোন উল্লেখ নাই। বৃন্দাবনের পক্ষ হইতে যখন কুসুমকে ফিরাইয়া লওয়ার কথা হয় তখন কুসুম আপত্তি করিয়াছিল। প্রথম কারণ, সে চলিয়া গেলে তাহার নিরীহ, অসমর্থ, অল্পবুদ্ধি ভাইটির অবস্থা কি হইবে। দ্বিতীয় কারণ, সে ভদ্রকন্যাদের সহিত একসঙ্গে লেখাপড়া শিখিয়াছে। তাহার আচার-ব্যবহার তাহাদের অপেক্ষা হীন নহে। তাহাকে সকলেই বিধবা বলিয়া জানে। এই অবস্থায় যদি তাহার আবার একবার বিবাহের কথা হয় তবে তাহা লইয়া চারিদিকে কলরব উঠিবে, তাহার সঙ্গিনীদের কৌতুক বাড়িবে। সর্ব্বোপরি যাহারা তাহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে তাহাদের কাছে তাহার মর্য্যাদা যে আবার ক্ষুণ্ণ হইবে না তাহাতেই বা নিশ্চয় কি? এই সব কারণে সে কোন প্রকার সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্য দিয়া বৃন্দাবনের বাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা করে না। তবে কুসুমের আপত্তি করিবার আর একটা কারণ ছিল মনে হয়। সে অভিমানিনী। বৃন্দাবনের পিতা একদিন তাহার মায়ের নামে কলঙ্ক তুলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল—সে-কথা সে ভুলিতে পারে নাই, এবং সেইজন্য সে বৃন্দাবনের পক্ষের আহ্বানকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এমন কি, সে বৃন্দাবনের

মায়ের আশীর্ব্বাদের বালা-জোড়াটি কুঞ্জর হাত দিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে।

কুসুমের দিন এক প্রকার কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যে-দিন সপত্নী-পুত্র চরণকে দেখিয়া তাহার নারী-হৃদয়ে মাতৃত্বের বান ডাকিয়াছিল সে-দিন তাহার মনের গতি মোড় ফিরিয়াছিল। ইহার পর সে চরণকে দিন কয়েকের জন্য আপনার স্নেহচ্ছায়ে রাখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। তারপর যে-দিন চরণকে এক প্রকার জোর করিয়াই তাহার নিকট হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেইদিন হইতে কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার যে-দিন সে চরণকে ফিরিয়া পাইয়াছিল সে-দিন যেন সে আপনাকে কিছু কালের জন্যও স্থির করিয়া রাখিবার একটা আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। এই চরণকে আশ্রয় করিয়াই সে ধীরে ধীরে তাহার শিক্ষার অহঙ্কার ও বৃন্দাবনের উপর অভিমান ত্যাগ করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইতেছে, "কেন, এ কি আমার নিজের হাতে-গড়া সম্বন্ধ যে আমি 'না' 'না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে? তাই যদি যাইবে, সত্যই তিনি যদি স্বামী ন'ন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাঁহারই উপর এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য?...আমিই তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, তবে কেন তিনি আমার এই অন্যায় স্পর্দ্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন তিনি জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্প পা দিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না?—নবম পরিচ্ছেদ। নারীর নিকটে মা হওয়ার লোভ কতই না সুন্দর, কতই না মধুর, মাতৃ-সম্বোধন কতই না মনোমুগ্ধকর, কতই না চিত্তচঞ্চলকারী!

কুসুম নারীজীবনের সুখের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষার গর্ব্ব সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সেইজন্য

যখন বৃন্দাবন তাহাকে চরণের হাত ধরিয়া তাহার মাতার নিকটে উপস্থিত হইতে বলিয়াছিল তখন কুসুম তাহাতে সম্মত হয় নাই। পায়ে হাঁটিয়া স্বামীর বাড়ীতে যাওয়ার কল্পনাটা তাহার শিক্ষিত মনে অপমানের মত আঘাত দিয়াছিল। অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক নয় বলিয়াই যে সব সময়ে উচিত তাহাও স্বীকার করা যায় না। কুসুমের মধ্যে যে নারীত্ব জাগিয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলে তাহার দাম্পত্য-সুখের পথে এই বাধা অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। বৃন্দাবন আবার বিবাহ করিবে—এ-কথা যে-দিন কুসুম শুনিতে পাইল সে-দিন তাহার আর অশ্রুবর্ষণের অবধি নাই। সে সন্তানের জননী-পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও স্বামীর ঘর করিয়া সপত্নী-সন্তানকে ভালবাসিয়া দাম্পত্যসুখ-ভোগের যেটুকু পথ বাকী ছিল তাহা সে স্বহস্তে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। অথচ তাহার সমস্ত রুদ্ধ দুঃখ অশ্রুর প্রবাহে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে।

তুচ্ছ গর্ব্বের বশে ও অভিমানে কুসুম আপনার সুখের ভরা তরী কূলের কাছেই একেবারেই ডুবাইয়া দিল। বাড়ল গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া যে-দিন বৃন্দাবন চরণকে কুসুমের নিকটে রাখিতে আসিয়াছিল সে-দিন কুসুম অভিমানের বশেই তাহাকে রাখে নাই—কি ভুলই না করিল! অথচ একদিন এই চরণকে দেখিয়া তাহার রুদ্ধ হৃদয়ের সুপ্ত মাতৃত্ব উদগ্র-চঞ্চলতাসহকারে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাগ ও অভিমান এম্‌নি করিয়াই মানুষকে অন্ধ করিয়া তুলে। ইহার পর যখন সে চরণকে পাইল তখন চরণ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় পরমেশ্বরের কোলে স্থান পাইয়াছে।

ইহার পর কুসুম বৃন্দাবনের সহিত মিলিত হইয়া যে-পথে চলিয়াছে তাহা দাম্পত্য-জীবনের পথ নহে, তাহা সংসার-বিরক্ত জীবনের বৈরাগ্য অবলম্বনের পথ। কুসুমের নারীত্ব ও মাতৃত্ব উভয়ই অপরিণত ও অপূর্ণ রহিয়া গেল।

'গৃহদাহে' মহিমের প্রতি মৃণালের প্রণয় অনেকটা দেবদাসের প্রতি পার্ব্বতীর প্রণয়ের ন্যায়। দেবদাস পার্ব্বতীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সামাজিক প্রথানুসারে যাহার সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ হইয়াছিল তাহার সহিত সে সাংসারিক জীবনে এমন ব্যবহার করিয়াছে যে, তাহাতে বাহিরের কেহ তাহাকে দোষ দেওয়া দূরের কথা, তাহার ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে পারে। মৃণাল মহিমকে ভালবাসিত। মহিমই মৃণালের হৃদয়-দেবতা, কিন্তু বিধি-চক্রে এক বৃদ্ধের সহিত মৃণালের বিবাহ হইয়া যায়। মৃণাল পার্ব্বতীরই মত সাংসারিক জীবনে সেই বৃদ্ধকেই তাহার স্বামীর মত দেখিয়াছে, তাহার মাকে নিজের মা বলিয়া জানিয়াছে, তাহারই সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, বৃদ্ধ ইহলোক ত্যাগ করিলে মৃণাল হিন্দু বিধবার সমস্ত আচার পালন করিয়া সামাজিক অনুশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু সমাজ তাহার মনের কথা টের পায় নাই। সেইজন্য সে সমাজের চক্ষে আদর্শ সতী। যাহাই হউক, বৃদ্ধের সহিত বিবাহ হইলেও মৃণাল কদাপি মহিমকে বিস্মৃত হয় নাই। তাহাকে যাহাতে সুখী করিতে পারে সে সেই দিক্ দিয়া সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে। সে মহিমের সংসার-যাত্রায় সাহায্য করিয়াছে, মহিমের গুরুতর পীড়ার সময় প্রাণপাত সেবা দিয়াছে, আর সেই সঙ্গে আপনার অন্তরের কথা লুকাইয়া রাখিয়া সংযত ও সংজ্ঞাত আত্মাকে এবং ছিদ্রান্বেষী বহির্জগৎকে এই প্রকার ক্রিয়াকর্ম্মের দ্বারা পার্ব্বতীর মতই পরিতৃপ্ত করিতেছে।

'চরিত্রহীনে' সতীশের প্রতি সাবিত্রীর প্রেম অনেকটা প্রথম দর্শনে প্রণয়ের মত। প্রথম হইতে সতীশের উপর সাবিত্রীর একটু অতিরিক্ত রকমের স্নেহ জন্মিয়াছিল। সাবিত্রী মেসে ঝির কাজ করিত। মেসে সতীশ ছাড়া আরও অনেকেই থাকিত। কিন্তু সাবিত্রী সর্ব্বদা তাহার

একটি চোখ ও একটি কান সতীশের উদ্দেশেই নিযুক্ত করিয়া রাখিত। শরৎচন্দ্র প্রথম হইতেই সাবিত্রীর দ্বারা সতীশের পূজা-আহ্নিকের যোগাড় করা, পানজল আনিয়া দেওয়া, বিছানা রোদে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া দৃশ্যটাকে এমন জমাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাহাতে পাঠকের মনে আপনা হইতে অজ্ঞাতসারে তাহাদের জন্য সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্ব থাকিয়া যায়, যেন এটা একটা সাংসারিক ব্যাপার, গোলমালের নয়। সতীশও যে তাহাকে ভালবাসে ইহা তাহার মনের অগোচর ছিল না। সেইজন্য সতীশের উপর আপনার ন্যায্য অধিকার বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষাটা মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িত। সাবিত্রী প্রণয়ের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। সতীশ যে দিন পকেটে একতাড়া নোট লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল সে-দিন সাবিত্রী তাহার পকেট হইতে নোটগুলি তুলিয়া লইয়াছিল এবং তাহাকে যাইতে দিবে না এইভাবে দুই হাতে চৌকাঠ ধরিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নোটগুলি সতীশের বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া তাহার চাবি নিজের রিঙে পরাইয়াছিল। সতীশ যখন বলিল—'যদি চুরি কর?' সাবিত্রী তখন বলিল—'আমি চুরি করলে আপনার গায়ে লাগ্‌বে না।'—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। মেসের ঝি সাবিত্রীর এই রকম ব্যবহারকে তাহার প্রণয়ের পথে দু'এক পা অগ্রসর হইবার বহিঃপ্রকাশ বলিতে পারা যায়। সাবিত্রী সতীশের অমঙ্গল দেখিতে পারিত না, অকল্যাণ সহ্য করিতে পারিত না। লেখাপড়ার দিকে সতীশের মন নাই দেখিয়া সাবিত্রী তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। তাহার সহিত ব্যবহারে সতীশের দোষ সে কিছুমাত্র দেখিতে চায় না ও পায় না। সতীশের কোন ব্যবহারই তাহার নিজের পক্ষে অপমান বলিয়া জ্ঞান করে না। সতীশের কাজকর্ম্ম লইয়া তাহার মাথা ঘামাইয়া মরিবার প্রয়োজন নাই, তবুও

যেন আছে। তাহা না হইলে সে স্বস্তি পায় না, অস্বস্তি অনুভব করে। বিপিন-বাবুরা সতীশকে সে-দিন ধরিয়া লইয়া গেলে সে কখন্ ফিরিয়া আসিবে—এই ভাবিয়া সাবিত্রী শীতে কষ্ট করিয়া সমস্ত রাত্রি তাহারই অপেক্ষায় দরজার গোড়ায় বসিয়া কাটাইয়াছিল। প্রেম স্বতন্ত্র বস্তু। সে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিতে গিয়া কলঙ্কের কালিমায় কলুষিত হইবার বাধা পায় না বলিয়াই অন্ধ।*

সাবিত্রী বিধবা। সে তাহার বিবাহিত স্বামীকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ নাই। সে হিন্দু-বিধবার অনেক আচার পালন করে। সন্ধ্যা-আহ্নিক করে, একাদশীর দিনে উপবাস করে, রাত্রিতে ভাত খায় না। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে সে আপনার উদরান্ন সংস্থানের জন্য মেসে দাসীবৃত্তি করিতেছে। তাহার মধ্যেও মানাপমান-বোধ আছে। সতীশ তাহাকে ভালবাসে একথা সে জানিত। কিন্তু সতীশের ভালবাসার স্বরূপটা সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সেইজন্য যে-দিন সতীশ তাহারই ঘরে বসিয়া তাহাকে সামান্য বেশ্যা মনে করিয়া তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়াছিল সে-দিন সে অন্তরে বড়ই আঘাত পাইয়াছিল। বেশ্যার আড্ডার মধ্যে থাকিয়া কোন নারী যে সংযতভাবে থাকিতে পারে, কিম্বা একজনকে একনিষ্ঠভাবে একান্ত নিবিড় করিয়া ভালবাসিতে পারে একথা সতীশের জানা নাই, সেইজন্য সে সাবিত্রীকে ঠিক্ চিনিতে পারে নাই। প্রেমাস্পদের অবিশ্বাস সাবিত্রীর সহনাতীত। সাবিত্রী সংযতা, বুদ্ধিমতী। সে মনে করে যেখানে এক পক্ষে প্রেম অগভীর সেখানে উভয় পক্ষে দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই

---

* Love looks not with the eyes, but with the mind,
And therefore, is winged cupid painted blind.
—Shakespeare.

ভাল। সাবিত্রী সতীশকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। সতীশই তাহার সর্ব্বস্ব। সতীশ তাহার হৃদয়ের দেবতা, তাহার কল্পনার স্বর্গ, তাহার ভ্রষ্ট জীবনের ধ্রুবতারা, তাহার ইহকাল পরকাল সব। সতীশ নষ্ট হইয়া যায়, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, ইহা সে আপনার চোখে দেখিতে পারে না। সে তাহার কোন প্রকার অকল্যাণ, বিশেষভাবে মানসিক অধঃপতন সহ্য করিতে পারে না। সতীশের প্রতি সাবিত্রীর প্রণয় কেবল দৈহিক-সম্ভোগের কামনা নহে, বরং ইহারই বিপরীত। উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল—তাহা বয়সের পার্থক্য। সাবিত্রী সতীশের চেয়ে বড়, এ কথা বোধ করি তাহার অজ্ঞাত ছিল না। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ না হয়—এই জন্য সাবিত্রী সে-দিন সতীশকে মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিল এবং সে নিজেও আর মেসে কাজ করিতে যায় নাই। কিন্তু এই সতীশকে দেখিবার জন্য, তাহার সেবা করিবার জন্য, তাহাকে সুখী করিবার জন্য সে অন্তরে কাতর হইয়া উঠিয়াছিল।

যে-দিন সতীশের বাসায় সতীশের সহিত সাবিত্রীর দেখা হয় সে-দিন সে নিজের সম্বন্ধে আগাগোড়া মিথ্যাই বলিয়াছিল। একে ত সে মেসে দাসীবৃত্তি করে বলিয়া সকলের মনে তাহার সম্বন্ধে কুলটা কথাটা এক প্রকার বদ্ধমূল হইয়াছিল। তারপর তাহার প্রেমাস্পদ সতীশই সে-দিন তাহাকে বারাঙ্গনা-শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়াছে। সে পরপুরুষে আসক্ত, সে সতীশের প্রেমের প্রতিদান দেয় নাই—এই ধারণা লইয়া সতীশ তাহাকে ঘৃণা করে বুলিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ-অন্তরায় কাটাইয়া সে কি করিয়া তাহারই একনিষ্ঠ প্রেমের প্রমাণ দিবে! তাহার অন্তরের কথা ত কেহ বুঝিবে না। যদি কখনও সতীশ তাহাকে গ্রহণ করে তবে সামাজিকভাবে সে স্থান পাইবে না। সকলেই তাহাকে

সতীশের রক্ষিতা বলিয়াই জানিয়া রাখিবে, যেমন উপেন্দ্র তাহাকে এই মনে করিয়া বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই রকম সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়াই বোধ হয় সে একান্ত অসহায়ভাবে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, আপনার মনের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া স্বীয় মর্য্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার আয়াস করে নাই। সাবিত্রী মনে মনে বেশ জানে যে, সতীশ তাহাকে ভালবাসে এবং সতীশ তাহার ভালবাসার উপর সন্দেহ করিয়াই তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। সাবিত্রীর আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার উপায় ছিল না বলিয়াই করে নাই। সে জানে সতীশ তাহার প্রতি যতই ঘৃণা প্রকাশ করুক না কেন, সে নিজে তাহাকে ভালবাসে এবং সেই জন্যই তাহার উপর তাহার শাসন করিবার অধিকার আছে। সতীশ তাহাকে ভালবাসুক বা না বাসুক সে সতীশকে হৃদয়ের যে স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছে সেখান হইতে কিছুতেই তাহাকে সরাইবে না। সতীশের বিপদের দিনে সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইবে। সাবিত্রী সতীশের বাসা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় বেহারীকে বলিয়া যাইতেছে—"আমার ঠিকানা লিখে জানাব, যদি কখনও বোঝো, আমার আসা দরকার, আমাকে জানিও……আমি ছাড়া ওঁকে কেউ শাসন করতেও পার্‌বে না, আমার চেয়ে বেশী কেউ বিপদের দিনে সেবা কর্‌তেও পারবে না।"—২১শ পরিচ্ছেদ। সাবিত্রী ভালবাসিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে চায়, ব্যথায় ব্যথিত হইতে চায়, অশুভ আশঙ্কায় প্রেমাস্পদের জন্য শুভ ও সুখই কামনা করে।

সাবিত্রী সতীশের আর খোঁজ-খবর লয় নাই। সে জানিত সতীশের বিশ্বস্ত ভৃত্য দরকার মনে করিলে নিশ্চিতই তাহাকে জানাইবে। যে-দিন কাশীতে সে বেহারীর নিকট হইতে সতীশের মদ-গাঁজা-সেবা, সাধুবাবার শিষ্যত্ব-গ্রহণ প্রভৃতির কথা শুনিল সে-দিন সে সতীশকে

উদ্ধার করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল, এবং সতীশের পীড়ার সময়ে তাহাকে তাহার আন্তরিক সেবা-যত্ন দিয়া বাঁচাইয়া তুলিয়া নারীর সেবাপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিল। শুধু তাহাই নহে, সে যে একদিন বলিয়াছিল—আমি ছাড়া তাঁহাকে (সতীশকে) আর কেউ শাসন করতে পারবে না—তাহার প্রমাণ সে রাখিয়া গেল। সতীশের সাধুসঙ্গ সাঙ্গ হইল।

সতীশের সহিত সাবিত্রীর বাহিরের মিলন হয় নাই। সে-দিক্ দিয়া সামাজিক বিধি-নিষেধটাই প্রবল বাধা ছিল। "সমাজ যে-স্ত্রীকে তাহার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই তো সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তাঁর বজায় ক'রে রাখেন।" কিন্তু অন্তরে সতীশই ছিল তাহার প্রভু, দেবতা, স্বামী। সাবিত্রীর প্রণয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, উন্মাদনা নাই, আবিলতা নাই। সেখানে প্রিয়ের জন্য যে শুভকামনা আছে তাহাতেই যেন প্রিয়ার তৃপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ফাঁকি নাই, সেইজন্য এ কামনার গণ্ডী-রেখা সংকীর্ণ নয়, কারণ তাহার দৃষ্টি-রেখার গভীরতা আছে, প্রসার আছে, যাহাতে সতীশ উচ্ছৃঙ্খল না হয়। একজন মেসের ঝির পক্ষে যে এত বুদ্ধি, এত বিবেচনা ও এত সদিচ্ছার প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা হয়ত অনেক সময়ে কল্পনা করা যায় না। সেইজন্য সাবিত্রীকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার পক্ষে শরৎচন্দ্র তাহাকে সংযত, নীতি-ও নিষ্ঠাপরায়ণা হিন্দু-বিধবা করিয়াছেন, আর তাহাকে প্রেমরসে সিক্ত করিয়া এই নিষ্ঠার ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। "সত্যই মানুষের অসংযমকে অশ্লীলতা বলে, কতকগুলা কামনাকে আমরা পঙ্কিল বলিতে শিখিয়াছি বলিয়াই ত উহা অশ্লীল নয়।"

শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' পুস্তকের এক পাল্লায় কামনা-পরিপূরণের এক নগ্ন চিত্র লাগাইয়াছেন, ভারসাম্য-সংসাধনের জন্য আর এক পাল্লায়

এক গভীর, সংযত প্রেমের বাটখারা ফেলিয়াছেন। শরৎচন্দ্র নিপুণ, তাঁহার নিপুণতার মধ্যে চাতুর্য্য এই যে, তিনি সরোজিনীর সহিত সতীশের পরিণয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাবিত্রীর গভীর প্রেমকে ব্যর্থ করিয়াছেন, —এক দিক্ নিপুণভাবে ক্ষয় করিয়া গঠনের কথা আর না তুলিয়া অন্য দিক্ কৌশলে চাপা দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। অথবা বলিতে পারা যায়, চিত্তাকাশে মুহূর্ত্ত-উদ্ভাসিত তড়িৎ-রেখাই হয়ত এ পৃথিবীর যাহা কিছু গভীর তাহার পক্ষে দাগ কাটিবার একমাত্র ক্ষণস্থায়ী ভৌতিক সঙ্কেত, বাকীটা কেবলই দীপ্তির পরিমাপ, যাহা চোখের ভিতর দিয়া গিয়া মনের কোঠায় পৌঁছে। সেখানে যেন তার অক্ষয় সঞ্চয়, আর সেখানকার বিপুল আয়োজন এক দীপ-শলাকা হইতে অন্য এক দীপ-শলাকা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বালিবার জন্যই চরম বলিয়া মনে হয়।

শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে' কিরণময়ীর যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা সাবিত্রীর চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলা যায়। কিরণময়ী ছেলেবেলায় অপরের আশ্রয়ে থাকিয়া মানুষ হয়। বড় হইলে হারাণ-বাবুর সহিত তাহার পরিণয় হয়। স্বামীর সহিত কিরণময়ীর সম্বন্ধকে মধুর দাম্পত্য সম্বন্ধ বলা চলে না। হারাণ-বাবু বিদ্যা-চর্চ্চা লইয়া সমস্ত দিবারাত্র এমন ভাবে মস্‌গুল হইয়া থাকিতেন যে তিনি পত্নীর দাবীর কথাটা এক দিনের জন্যও মনে আনিতে পারেন নাই। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছিল। শ্বশ্রূ অঘোরময়ীও কিরণময়ীকে বরাবর যতদূর সম্ভব নির্য্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। এমনই অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া কিরণময়ী কোন দিন নারীত্বের মাধুর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ফলে, তাহার মন স্বামীর নিকট হইতে অপসৃত হইয়াছিল এবং শ্বশ্রূর উপর বিরক্ত হইয়াছিল। কিরণময়ী যুবতী। সে রূপসী। তাহার যৌন ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয় নাই।

সে তাহা মিটাইতে চায়। হারাণ-বাবুর অসুখের সময় সে সুযোগ বুঝিয়া অনঙ্গ ডাক্তারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিরণময়ীর ছেলে-বেলার প্রণয়ের ইতিহাস নাই। বিবাহিত জীবনের যে প্রেম তাহা হইতে সে বঞ্চিত। যেখানে যেখানে তাহার ভালবাসা কাহারও উপর পড়িয়াছে সেই সেই স্থানে তাহা স্বচ্ছ, শুভ্র, নির্ম্মল, একনিষ্ঠ প্রণয় নহে, তাহা তাহার অদম্য কামনার আবিলতা। স্বামী মৃতকল্প, এ অবস্থায় কোন নারী কি আপনার ভোগসুখের জন্য ব্যস্ত থাকিতে পারে? অনেকেরই কাছে ইহা হয়ত বাহুল্য মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা সম্ভব। এরূপ ঘটনার প্রচুর সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না, তবে এমন ঘটনা যে ঘটে তাহার উদাহরণের অভাব নাই। তাই বলিয়া তাহার চিত্রাঙ্কন সাহিত্যে প্রচলিত হইবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

কিরণময়ী প্রথমে উপেন্দ্রের উপর প্রসন্নচিত্ত ছিল না। পরে দিন কয়েকের মধ্যে উপেন্দ্রের পরোপচিকীর্ষা, রাত্রি জাগরণ করিয়া হারাণ-বাবুর সেবা প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া তাহার উপর তাহার অপ্রসন্নতার স্থলে শ্রদ্ধার ভাবটা আসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সঙ্গে সে স্বামীর মৃত্যুর সহিত কি সম্পদ হারাইতে যাইতেছে—এই কথাটা তাহার মনের মধ্যে অকস্মাৎ ধাক্কা দেওয়ায় সে একেবারে আকস্মিক ভাবে আপনাকে স্বামীর সেবায় নিয়োগ করিয়া দিয়াছিল। ইহার পর সে সতীশের মুখ হইতে উপেন্দ্র ও সুরবালার মধুর দাম্পত্য সুখের কাহিনী শুনিয়াছে। উপেন্দ্র ও সুরবালা উভয়ে উভয়কে নিবিড়ভাবে ভালবাসিত—ইহা সে মনের মধ্যে যতই আলোচনা করিতে লাগিল ততই তাহার মন অনঙ্গ ডাক্তারের বিরুদ্ধে যাইতে লাগিল। অনঙ্গ তাহার প্রাপ্য টাকা দাবী করিলে কিরণময়ী রমণীর বড় সাধের বড় সুখের অলঙ্কারগুলি আনিয়া তাহার কাছে ঢালিয়া দিল। সে আজ

অনঙ্গকে দূরে সরাইয়া দিতে পারিলে বাঁচে। কিরণময়ী ডাক্তারকে সরাইয়া দিল বটে, কিন্তু তাহার মন আর একজনকে আশ্রয় করিতে ছুটিল, সে হারাণ-বাবু নয়, সে উপেন্দ্র। সে যে জীবনে ভুল-ভ্রান্তি করিয়াছে বা করিতে পারে, এ-বিষয়ে সে সচেতন। সে যে যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিতে চায়, ইহা তাহার সচেতন মনের অগোচর নহে। এমন কি, দীর্ঘকাল সংযম ও বাঁধন-কষণের মধ্যে থাকিলেও যে, তাহার অপরিতৃপ্ত এবং নিম্ন-পর্য্যায়ভুক্ত বৃত্তিগুলি নষ্ট হইবে না—ইহাও তাহার ধারণা। আসল কথা, সে শিক্ষিতা, রূপসী ও আধুনিক নারী। নারীর সহজাত অগভীর প্রবৃত্তি লইয়াই সে এ জগতের যৌবন ভোগ করিতে চায়। উপেন্দ্রের উপর তাহার যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহাই এখন প্রণয়ের ফিকা রূপ লইতে উৎসুক।

কিরণময়ীর ভালবাসা বিশুদ্ধ প্রেম নহে। তাহা সংকীর্ণ-অগভীর-আবিলতাপূর্ণ-কামনা-তৃপ্তিমূলক। সে উপেন্দ্রকে পাইবার বাসনা করিয়াছিল। কিন্তু উপেন্দ্রের সুরবালা ছিল। আর তাহার কঠিন পবিত্রতাবরণ ছিল। তাহার কাছে প্রণয় যে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহাকেই বেশী করিয়া আঘাত করিবে—একথা সে বুঝিতে পারে নাই। সে উপেন্দ্রকে ডাকিয়া তাহার প্রেমের কাহিনীটা উপেন্দ্রের দুই কানে ভাল করিয়া বর্ষণ করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার কামনার জ্বালা মিটে নাই, মিটিবার কোন উপায়ও হয় নাই। কিরণ উপেন্দ্রের আশায় ব্যর্থমনোরথ হইল।

ইহার পর আখ্যান যে-দিকে ফিরিল তাহাতে প্রথমে একটা কথা বলিবার এই যে, উপেন্দ্র বিচক্ষণ, বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি, তিনি কিরণ-ময়ীকে লালসাময়ী জানিয়াও প্রাপ্তযৌবন দিবাকরকে তাহারই তত্ত্বাবধানে রাখিতে কিরূপে ভরসা পাইলেন? আমাদের মনে হয়,

মানুষমাত্রেরই যেমন কখন্ কি ভাবে ভ্রান্তি ঘটিয়া যায় তাহা সে ঠিক্ বুঝিতে পারে না, উপেন্দ্রের বোধ হয় তাহাই হইল, অথবা শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই এখানে উপেন্দ্রকে দুর্ব্বল করিলেন এবং দুর্নীতি ও কুৎসিত কামনা-উদ্দীপক যৌবনলোলুপতা প্রচারে প্রয়াসী হইলেন।

ইহার পর দেখা যায়, প্রথমে কিরণময়ী যে-দিবাকরকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত গ্রহণ করিয়াছিল, পরে তাহাকে সে তাহার কুৎসিত কামনা পরিপূরণের আস্পদ হিসাবে দেখিতেছে। স্নেহ প্রণয়ের রূপ ধারণ করিল। কিরণময়ীর লালসা উগ্র হইয়াই ছিল, এখন দিবাকর তাহার চরিতার্থতার সহায়ক হইল। কিরণময়ীর শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। কিরণ হারাণ-বাবুর নিকট বহু বিষয় শিখিয়াছিল, তাহার স্বাধীন চিন্তা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে প্রেমের আলোচনা হইত, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ছিল না—গুরুশিষ্যের পার্থক্যটাই বেশী ছিল। স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার মধ্য দিয়া কিরণময়ীর প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নারীর সহজাত প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয় নাই। সে হারাণ-বাবুর নিকট বহু বিষয় শিখিয়াছিল কিন্তু তাহার সংযমের শিক্ষা হয় নাই। শিক্ষা-সংযমের ফল আছে সত্য, কিন্তু যে যাহা সে তাহাই থাকিবে।

কিরণময়ী বুদ্ধিমতী, ছলনাময়ী। সে ইতোপূর্ব্বে দিবাকরের যুবচিত্তকে যে-দিকে টানিয়া আনিয়াছিল তাহাতে দিবাকরের পক্ষে কিরণময়ীকে একেবারে এড়াইয়া চলিবার আর ক্ষমতা ছিল না। কিরণময়ী তাহাকে টানিয়া লইয়া আরাকানের জাহাজে উঠিয়া বসিল। জাহাজে কিরণময়ী ও দিবাকরের ব্যবহারের যে সব চিত্র শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে কোন কোন চিত্রের কথা পুনরুল্লেখ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না।

অবশ্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও বাস্তব জীবনে তাহা হুবহু দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রকারের চিত্র 'চরিত্রহীন' প্রকাশের পূর্ব্বে আমাদের দেশে খ্যাতনামা লেখকের দ্বারা সম্ভব ছিল বলিয়া জানা যায় না। আর অধুনা বাস্তব জীবনে এই চিত্রের বে-পরোয়া প্রকাশ লাভ হইতেছে। ইহা 'চরিত্রহীন' ও ইহার প্রভাবে প্রভাবিত এতজ্জাতীয় অন্যান্য পুস্তকের প্রকাশের ফল বলিয়াই মনে হয়। শরৎচন্দ্র জাহাজে দিবাকর ও কিরণময়ীর ব্যবহারের যে নগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাকে সরল ও সহজ কথায় বিশ্রী ব্যভিচারের চিত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। লেখক যদিও আর টানিয়া চলেন নাই, কিন্তু তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা হীন। এই প্রকার নগ্ন চিত্রকে যৌন-বিজ্ঞান চর্চ্চার চেষ্টা বা অতি আধুনিক (ultra-modern) শিল্প (art) সৃষ্টির প্রয়াস, অথবা বাস্তব ব্যাপার বর্ণনা করিবার আয়াস বলা চলে না। কারণ, প্রথমতঃ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ যৌনবিজ্ঞান চর্চ্চা নহে, তাহা উগ্র কামনার পরিপূরণের সাময়িক তৃপ্তির চিত্র। আর ইহা শিল্প নহে, কারণ ইহা ক্ষণিক সুখদায়ক হইলেও নিবিড় আনন্দপ্রসূ নয়, বরং পরক্ষণেই বিতৃষ্ণা ও তিক্ততা আনিয়া দেয়। আর ইহাকে বাস্তব চিত্র আঁকিবার প্রয়াস বলিয়াও সমর্থন করিতে পারা যায় না। কারণ, উদগ্র কামনাকে যদি বাস্তব চিত্র বলিয়া এমন ভাবে সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করা হয় এবং শৃগাল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি ইতর জীবজন্তু যাহা লইয়া মারামারি করে তাহাই মানবের উপযুক্ত কাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া একটা হীন পাশবিকতাকে নগ্ন করিবার চেষ্টা করা হয় তবে বাস্তবতার নামে মানবের মলমূত্র ত্যাগের বর্ণনা, নর্দ্দামা, আস্তাকুঁড়ের বর্ণনাও সাহিত্যের আসরে চালাইতে দোষ কি? আর দিবাকর ও কিরণময়ীর নগ্ন ব্যবহারকে যদি এমন ভাবে সর্ব্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে একটুও না বাধে

তবে আদিম অসভ্য সমাজের মত নগ্ন অবস্থায় নরনারীর অবাধে মিলিত হইতে বা মিলিত হইবার উপদেশ দিতে অন্ততঃ লেখকের মতে দোষের হয় না। শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দেহের মিলন হয় নাই। যেখানে মনে পাপ আছে, দৈহিক মিলনের যতটা বলা সম্ভব ততটা টানিয়া শেষ করিয়াছে, সেখানে পাপ বা ব্যভিচারের চিত্র অঙ্কিত করি নাই—সেখানে সাহিত্য-স্থষ্টির চেষ্টা করিয়াছি, শিল্পকে নূতন রূপ দিয়াছি, বাস্তবকে সাহিত্যের আসরে টানিয়া আনিয়া অপরূপত্ব ফলাইয়াছি—এই মিথ্যা অজুহাত চলিতে পারে না, চলা উচিতও নয়। তবে শরৎচন্দ্রের নিজের পক্ষ হইতে একটা কৈফিয়ৎ তাঁহার মনের মধ্যে থাকিলেও থাকিতে পারে এবং থাকাটাই অতি স্বাভাবিক—তাহা এই—ব্যবসাবুদ্ধি। গ্রন্থের মধ্যে এই প্রকার অতি-রোম্যান্সের স্থষ্টি করিয়া আপনার পুস্তকগুলির অতি দ্রুত অধিক সংখ্যক লোকের করায়ত্ত হওয়ার পক্ষে একটা চতুর চেষ্টা। এখন এইটুকু বলিতে চাই যে, এই প্রকার সাহিত্য সমাজ-জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে এবং ইহার প্রচার বন্ধ হওয়াই মঙ্গল।

কিরণময়ী মনে করিত, যেহেতু সে বিধবা, সেই হেতু তাহার উপরে (বিশেষভাবে তাহার দেহের উপরে) কাহারও ন্যায়সঙ্গত দাবী নাই, এবং যেহেতু দিবাকর অবিবাহিত সেই হেতু তাহার হৃদয়ের উপরও কাহারও অধিকার নাই। এই অবস্থায় তাহাদের ভালবাসাটা অন্যায় ও অবৈধ নয়। তাহার মতে 'বৈধ' 'অবৈধ' কথাগুলা সংস্কারের বুলি মাত্র। ইহার কোন যুক্তি নাই এবং সেই কারণে ইহার কোন অর্থও নাই। জাহাজে যে বাড়ীউলির সহিত দিবাকরের আলাপ হইয়াছিল তাহার নিকট কিরণময়ী যে-ভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে দিবাকর ও তাহার সম্বন্ধটা স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্বন্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছে।

একদিন 'গৃহদাহে' অচলা ট্রেণের মধ্যে ডিহরির সেই অপরিচিতা মেয়েটির নিকট সুরেশকে আপনার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। কিরণময়ী পরকাল বিশ্বাস করে না, ইহকালের সুখই তাহার নিকটে সর্ব্বস্ব। সে eat, drink and be merry এই নীতির মূর্ত্ত বিকাশ। যদি উপভোগের পঙ্কিলতার মাত্রা বাড়িয়া না যাইত তবে তাহার মত চরিত্র চিত্রণে তেমন কিছু আসিয়া যাইত না।

কিরণময়ী দিবাকরকে আরাকানে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সে দিবাকরকে লইয়া সুখী হইতে পারে নাই। যেখানে কামনাই প্রবল, সেখানে অতৃপ্তি, অশান্তি, বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা। আত্মরক্ষার নামে কিরণময়ীর বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি দেখা দিয়াছে। দিবাকরের উপর হইতে তাহার আসক্তি দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র কামনা ও ছলনাকে আশ্রয় করিয়া কিরণময়ীর জীবনের অবসান হইল। যে প্রবৃত্তি সহজাত তাহাকে প্রচণ্ডভাবে প্রকট করিয়া তুলিবার উগ্র চেষ্টার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই। অথচ শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর মধ্যে আপনার এই চেষ্টাই বিশদ ভাবে দেখাইয়াছেন।

'শ্রীকান্তে'র অন্নদা হিন্দুর বদ্ধমূল সংস্কারকে আপনার অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়া ষোড়শীর মত আপনার বিবাহিত স্বামীরই চরণ-তলে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। অন্নদার স্বামী অন্নদার দিদিকে হত্যা করিয়া নিরুদ্দেশ হয়। সাত বৎসর আর উভয়ের দেখা নাই। নারায়ণ সম্মুখে রাখিয়া অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া একবার সে যাহার হাতে সমর্পিত হইয়াছিল, সে একমাত্র তাহাকেই তাহার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে। সাত বৎসর পরে সে যখন স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল তখন তাহার স্বামী সাপুড়িয়া ও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত। স্বামী যাহাই হউক না কেন, সে স্বামীর সহধর্ম্মিণী। এই সংস্কারই

তাহার ধর্ম। সংস্কারকেই বিশ্বাস করিয়া সে হিন্দুর ঘরে মানুষ হইয়াছে। স্বামীর ভাল-মন্দ, গুণাগুণ বিচার করিবার শিক্ষা সে পায় নাই। সে স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য গোপনে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিল। স্বামীই তাহার জীবনের সব। অন্নদা সাপুড়িয়া স্বামীর সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছে, তাহার দুঃখের জীবনটাকে সে আপনার সুখের বলিয়াই বরণ করিয়াছে। সে কাঠ কুড়াইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, তাহার গাঁজার খোরাকও জোগাইয়াছে। অভাবের সময় কাহারও নিকট হাত পাতিবার তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু সে স্বামীর জন্যই ইন্দ্রনাথের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহার স্বামী মুসলমান হইয়া গিয়াছে, সে সহধর্মিণী, কাজেই সেও যে মুসলমানী একথা স্বীকার করিতে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ হয় না। অন্নদা তাহার বিবাহিত স্বামীকেই একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিল। কাজেই সে সাধ্বী, পতিব্রতা। কিন্তু সমাজের চক্ষে সে জাতি-ধর্ম-ত্যাগিনী বলিয়া রহিয়া গেল। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার মূল্য আছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যেখানে বিধি-ব্যবস্থা মূল্যহীন সেখানে চিরাচরিত সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্তী হইতে গেলে অন্নদা-দিদির মত দু'চারটি অমূল্য জীবন সংযম ও মহৎ শক্তির বলে মাত্র অশ্রুর অর্ঘ্য জোগাইয়া ব্যর্থতার বেদীমূলে বলি পড়ে, সন্দেহ নাই। তবুও তাহাদের উদ্ভাসিত জ্যোতিরেখা অন্ততঃ দু' একটি প্রাণেও চিরকাল ধরিয়া সুগভীর দাগ কাটিয়া চলে। ষোড়শীর মত অন্নদার মনে দুই বিপরীত ভাবের সংঘর্ষ বাধে নাই সত্য, কিন্তু ষোড়শীর মনেও যে বিশ্বাসের খেলা জয়ী হইয়াছিল তাহাই অন্নদার মধ্যেও বলবান হইয়াছিল। যে অন্নদা সতী ও সাধ্বী হইয়াও লোকচক্ষে কুলত্যাগিনী রহিল, সেই অন্নদাই ইন্দ্রনাথকে এ জগতের একমাত্র সহায় ও সহানুভূতি-

সম্পন্ন জানিয়াও স্বামীরই জন্য তাহাকে বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছে এবং নিজের বরণ-করা স্বামীর সাহচর্য্যের দুঃখ সুখের মত উপভোগ করিবার জন্য আর তাহার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানকে বিশিষ্টভাবে ব্যথার রসেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই মহীয়সী অন্নদা-দিদির অপরিসর জীবনের সুগভীর হৃদয়তল আমরা খুঁজিয়া পাই না। যতই চিন্তা করি ততই আমরা শরৎচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া পড়ি।

'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্ব্বে আমরা রাজলক্ষ্মীর প্রণয় ও প্রণয়ের ব্যর্থতার যে পরিচয় পাই তাহা অভিনব। মাতৃত্বই যেখানে প্রণয়ের পরিণতি সেখানে মাতৃত্বের গৌরবই তাহার প্রণয়ের পরিণতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। পাঠশালায় শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। সেই অবধি রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে আপনার অন্তরের মধ্যে গোপন রাখিয়া দুস্তর, দুর্গম, বৈচিত্র্যময় জীবনপথে চলিয়াছে। এক পাচক ব্রাহ্মণের সহিত রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হয়। পরে সে বিধবা হয়। পরে ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া সে বাইজীর জীবন আশ্রয় করে। শ্রীকান্তের সহিত তাহার দীর্ঘকাল দেখা নাই। তবুও শ্রীকান্ত তাহার হৃদয়ের যে স্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে সেইখানেই অজ্ঞাতসারেই রহিয়াছে। রাজকুমার-মজলিশে শ্রীকান্তকে দেখিতে পাইয়াই রাজলক্ষ্মী তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে। শ্রীকান্ত রাজকুমারের মো-সাহেবী করে। মো-সাহেবী করা যে কি নীচ কাজ তাহা রাজলক্ষ্মীর অজ্ঞাত নাই। সে এখন তাহাকে কোন প্রকারে বাড়ী পাঠাইয়া দিতে পারিলে আশ্বস্ত হয়। শ্রীকান্ত একদিন গভীর নিশীথে সাহসের পরীক্ষা দিতে মহাশ্মশানে যাইবে, একথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মীর ভয়ের আর অন্ত নাই। পাছে শ্মশানে তাহার কিছুমাত্র বিপদ ঘটে, এইজন্য সে রতন প্রভৃতিকে এক মাসের মাহিনা

বক্‌শিস্ দিয়া তাহার পশ্চাতে পাঠাইয়া দিয়াছে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু উভয়ের মিলন হয় নাই। তাহার আরও দুঃখ এই যে, সে তাহার প্রেমাস্পদকে কোন দিন কোন দিক দিয়া সুখী করিবার সুযোগ পায় নাই। শ্রীকান্তকে কাছে পাইয়া রাজলক্ষ্মী তাহাকে পাটনায় লইয়া যাইবার জন্য কথা উত্থাপন করে নাই। সে তাহাকে তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে। পাটনায় তাহার সপত্নীর ছেলে বঙ্কু আছে। বঙ্কু তাহাকে তাহার আপনার মায়ের মতই দেখে। এইজন্য শ্রীকান্তকে পাটনায় লইয়া যাইতে রাজলক্ষ্মীর সাহস হয় নাই। জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অচেতন অবস্থায় শ্রীকান্ত বাড় ষ্টেশনের ধারে পড়িয়াছিল। খবর পাইয়া রাজলক্ষ্মী নিজে আসিয়া তাহাকে পাটনায় লইয়া গিয়াছে। তাহার প্রাণের সেবা দিয়া তাহাকে আরাম করিয়া তুলিয়াছে। ছেলেবেলায় সে যাহাকে ভালবাসিয়াছিল সে-ই যে তাহার হৃদয়-দেবতা ইহা সে তাহার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রণয়-পূর্ত্তির পথে মাতৃত্বের গৌরব প্রতিবন্ধক হইল। শ্রীকান্তকে লইয়া দিন যাপন করিতে গেলে তাহাকে মাতৃত্বের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। রাজলক্ষ্মী তাহা সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য সে শ্রীকান্তকে আপনার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিতে চাহিতেছে। "আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকীপুর থেকে আস্‌ছে। বেশী দিন থাক্‌লে সে হয়ত কিছু ভাব্‌তে পারে।"—১১শ পরিচ্ছেদ। রাজলক্ষ্মীর প্রেমে বাহ্য উন্মাদনা নাই, চাপা আবেগ আছে। শ্রীকান্ত যতদিন তাহার কাছে ছিল, ততদিন যাহাতে তাহাকে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় সে-দিকে ত তাহার দৃষ্টি ছিল, অধিকন্তু কখনও সে তাহার মনোমত করিয়া সেবা করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িত না। সেইজন্য শ্রীকান্ত নিদ্রিত হইলে সে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার কপালের

উত্তাপ অনুভব করিয়াছিল এবং জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিয়াছিল। গায়ের কাপড়টা সরাইয়া দিয়া মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে বাহির হইয়া গিয়াছিল। ইহাই নিভৃত সেবার দ্বারা আত্মতৃপ্তির পরিচয়। নারীর দুর্ব্বল হৃদয় যাহাকে একান্তভাবে পাইবার কামনা করে, যাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সে একনিষ্ঠভাবে উন্মুখ, তাহাকেই যদি তাহারই মনের আর এক দিকের তাড়নায় দূরে সরাইয়া দিবার কারণ হইতে হয় তবে তাহাকে যে বেদনা ভোগ করিতে হয় তাহা তাহার পক্ষে মর্ম্মান্তিক। যে নীরবে এই বেদনা সহ্য করিতে পারে তাহার সহনশীলতা যে কত দৃঢ়, কত উচ্চ তাহা বলা যায় না। এই সহিষ্ণুতায় রাজলক্ষ্মী মহতী। সে বাইজির জীবন আশ্রয় করিলেও তাহার প্রণয় সংযত।

ইহার পর শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছেদ।

ছেলেবেলার বিচ্ছেদের পর রাজকুমারের মজলিসে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মধ্যে প্রথম বার সাক্ষাৎ হয়। পিয়ারীর পাটনার বাড়ীতে দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ। আমরা পিয়ারীকে অন্যক্ষেত্রে পিয়ারীরূপেই দেখি কিম্বা অন্য যে-রূপেই দেখি না কেন, শ্রীকান্তের উপস্থিতিতে আমরা তাহাকে রাজলক্ষ্মীরূপেই দেখিতে পাই। যখন শ্রীকান্ত পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে পাটনায় গিয়া উপস্থিত হয় তখন রাজলক্ষ্মীর সহিত তাহার তৃতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। রাজলক্ষ্মী গোপনে নিজের হাতে সেবা-যত্ন করিয়া তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বর্ম্মা যাইবার কথার প্রসঙ্গে রাজলক্ষ্মী বলিয়াছিল, "বর্ম্মায় গেলে মানুষ ফেরে না—সে খবর জানো?" রাজলক্ষ্মী বোধ করি শুনিয়াছিল, বর্ম্মায় গিয়া অধিকাংশ লোকই সাধারণতঃ বর্ম্মা রমণী লইয়া দিন যাপন করে—আর এ দেশে

ফিরিতে চায় না। শ্রীকান্তও যে সেরূপ না করিবে তাহাতে নিশ্চয় কি—এই আশঙ্কটাই বোধ হয় তাহার মনের কোণে জাগিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত যখন বলিয়াছিল—"সকলের মনের কথা ত জানিনে, রাজলক্ষ্মী, কিন্তু একজনের জানি। যদি কোন দিন ফিরে আসি ত শুধুই তোমার জন্য আস্‌ব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা কর্‌ব না।" এই কথায় রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের পায়ের কাছে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। যে শ্রীকান্ত তাহাকে এত ভালবাসে তাহাকেই সে একদিন দূরে সরাইয়া দিয়াছিল। সেই শ্রীকান্তই আজ আবার নিজে দূরে অতি দূরে চলিয়া যাইতেছে। আর সেইজন্যই সে আজ একবার দেখিতে আসিয়াছে। তাহার বড় ব্যথা—তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় তাহার নাই। রাজলক্ষ্মীর বোধ করি মনে হইয়াছিল—যদি শ্রীকান্ত এদেশে থাকে তাহা হইলে সে তাহাকে অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবে। সে-দিক্ দিয়া একমাত্র উপায় উন্মুক্ত ছিল—তাহাকে পরিণীত করিয়া সংসারী করা। সেইজন্য সে নিজেই কথার উত্থাপন করিয়াছে—"একটি বিয়ে করে সংসারী হও—সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।" সে শ্রীকান্তের উপর তাহার অধিকারকে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারে না। সেইজন্য সে নিজে পাত্রী মনোনীত করিয়া যেমন তাহার কল্যাণের দিক্‌টা উজ্জ্বল দেখিতে চায় তেম্‌নি তাহার অধিকারটাকে বেশ মোলায়েমভাবে বরাবরের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে চায়। যখন সে জানিল, শ্রীকান্ত নিজেই পাত্রী ঠিক্ করিয়া ফেলিয়াছে তখন তাহার স্বাভাবিক অধিকারে আঘাত লাগিল, সে ক্ষুণ্ণ হইল। সে পাত্রী ভাল নয় বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজেই কন্যা স্থির করিয়া দিবে বলায় শ্রীকান্ত বলিল—'আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি কোন দিন খুঁজে বার কর্‌তে পারবে না।' রাজলক্ষ্মী যেন অনন্যগতি হইয়া তাহার সহিত

বর্ম্মায় যাইতে চাহিল এবং কাতরভাবে বলিল, 'আমার এত থাক্‌তেও তোমার কোন কাজে লাগ্‌লনা।' শ্রীকান্ত তাহাকে সঙ্গে লইতে অস্বীকার করিয়া বলিল—"যেখানেই থাকি রাজলক্ষ্মী, চিরদিন আমি তোমারই থাক্‌ব। তোমার অমতে তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে (অর্থাৎ পরিণয়ে) আমার কোন দিন প্রবৃত্তি হবে না।" রাজলক্ষ্মী কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী আজ বড় অসহায়, আজ সে পিয়ারী নয়, সে রাজলক্ষ্মী। আজ সে আপনাকে আবদ্ধ রাখিবার মত কোথায়ও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতেছে না। ইহার পরেও কি সে বাইজির জীবন কাটাইবে? কিসের মোহে, কিসের লোভে, কিসের আশায়? যে অর্থ ও ঐশ্বর্য্য সে দু'হাতে অর্জ্জন করিয়াছে তাহা ত তাহার জীবনের বড় কাজে লাগিতেছে না।

শ্রীকান্ত বর্ম্মায় চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী বাইজির জীবন ত্যাগ করিল। একদিন সংসারে বাঁচিবার জন্য তাহার বাইজির জীবন অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। সে-দিন তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক শরীরের খোরাক যোগাড় করিবার ও সংসারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাগিদ ছিল। কিন্তু আজ সে তাগিদ ক্ষান্ত, অভাব মিটিয়াছে। আজ তাহার মনের খোরাক সংগ্রহ করা দরকার। সেইজন্য তাহাকে বাইজির জীবন পরিত্যাগ করিতে হইল।

শ্রীকান্ত কিছুদিন বর্ম্মায় কাটাইবার পর রাজলক্ষ্মীর সহিত দেখা করিবার জন্য আবার যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল তখন উভয়ের মধ্যে চতুর্থ বার দেখা। রাজলক্ষ্মী সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকান্তকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে পাটনার বাড়ী হইতে তাহার বইগুলি এবং গুড়গুড়িটি পর্য্যন্ত আনিতে ভুলে নাই। যে সূর্য্যাস্তের ছবিখানি তাহার বড় ভাল লাগিত সেখানি লইয়া আসিয়া সে তাহার শয়ন-কক্ষে টাঙাইয়া

দিয়াছে। এইভাবে প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া শ্রীকান্তকে সুখী করিবার তাহার সাগ্রহ যত্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর এইবারের সেবা-যত্নের মধ্যে একটা লক্ষ্য করিবার জিনিষ এই যে, সে অন্যান্য বারের মত আড়ালে থাকিয়া শ্রীকান্তকে সুখী করিবার চেষ্টা করে নাই, এবারে সে বন্ধু ও চাকরদের সম্মুখেই শ্রীকান্তের বিছানার ধারে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। সত্যই প্রেমের টানে বাহিরের বাধা কাটিয়া যায়।

কলিকাতা হইতে কাশী আসিবার পর শ্রীকান্ত প্রয়াগ যাইতে চাহিলে রাজলক্ষ্মী সঙ্গে যাইবে বলিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকান্ত একটা মিথ্যা দুর্নামের আশঙ্কায় তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহে নাই। ইহারই পূর্ব্বে একদিন শ্রীকান্ত কথায় কথায় বলিয়াছিল, "লক্ষ্মী, তোমার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করতে পারি কি ক'রে? ...সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষ মানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জ্জন দিতে পারি।" —১৩শ পরিচ্ছেদ—২য় পর্ব্ব। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে লইতে না চাহিলে রাজলক্ষ্মী অভিমানে উত্তেজিত হইয়াছিল এবং এই সক্রোধ অভিমানের বশে সে, যে বাইজির জীবন, যে আড়ম্বরময় জীবন, যে উন্মাদনার জীবন একদিন শ্রীকান্তের জন্য ত্যাগ করিয়াছিল তাহাই আর একবার গ্রহণ করিল। সে দেখাইতে চায়, একদিন যাহা ত্যাগ করিবার তাহার প্রেরণা ছিল তাহাই পুনরায় গ্রহণ করিবার তাহার অধিকার আছে। আপনার মনের উপর অভিমান করিয়া কি প্রতিশোধ লওয়া চলে! প্রেম যেখানে স্বতোৎসারিত, স্বতোচ্ছ্বসিত, স্বতঃস্ফূর্ত্ত সেখানে অভিমান করা যদি কখনও সম্ভব হয় তবে সে অভিমান যে অভিনয়, মিথ্যা, তাহা নাকি নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত আর

কাহারও উপর চলে না। সেইজন্য রাজলক্ষ্মীর পক্ষে অভিমানাহত হইয়া এতটা চঞ্চল হওয়া বোধ হয় সম্ভব হইয়াছিল। অভিমান করা কখনও সম্ভব হইলেও তাহাকে ত স্থায়ী করিয়া রাখা চলে না। সেইজন্য দেখা যায়, যে রাজলক্ষ্মী অভিমান-বশেই সরোষে বলিয়াছিল—"আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে," সেই রাজলক্ষ্মী আবার বলিয়াছিল,—"যদি অন্যায়ই একটা করে থাকি, তার কি মাপ নেই ? তুমি ক্ষমা না করলে আর কে আমাকে ক্ষমা করবে ?" "আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনও করতেই পারিনে, তা' জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজে হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ী লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট ক'রে দিয়ো না। আজ এমন ক'রে তুমি চলে গেলে আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারব না।" এই যে রাজলক্ষ্মীর সানুতাপ ও সানুনয় দোষ-স্বীকার ও মিনতিপূর্ণ ক্ষমা-প্রার্থনা—ইহাই প্রেমাস্পদের নিকট তাহার যথার্থ দাবী। সে বলিতে চায়,—শ্রীকান্ত, তুমি পুরুষ, ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় তোমার অভিমান করা চলে, কিন্তু আমি নারী, আমার অভিমান সাজে না। কারণ পুরুষ তুমি উদাসীন হইয়া থাকিতে পার, কিন্তু আমি যে বিরহের অন্তর্জ্বালায় জ্বলিয়া মরিব এবং সে জ্বালা কি লইয়াই বা ভুলিব ?

অধীশ্বরী হইবার আকাঙ্ক্ষা রাজলক্ষ্মীর অভিমানের ভিত্তি ছিল। এই আকাঙ্ক্ষাই তাহার দাবী। সে শ্রীকান্তকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তাহার জন্য বড় দুঃখ, বড় জ্বালা সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সে শ্রীকান্তের হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব করিবার দাবী দূরীভূত করিতে পারে না।

সমাজের চক্ষে শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর প্রেম অবৈধ। প্রথম অবস্থায় রাজলক্ষ্মী হয়ত সামাজিক বিধি-নিষেধের ভয় করিত, কিন্তু

মাতৃত্ববোধকে অপমানিত হইতে দেয় নাই। পরে দেখা যায়, সে মাতৃত্ববোধের অপমানের ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়াছে এবং সমাজের উপর অনেকটা উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। "আমার চেয়ে আপনার লোক আর তোমার নেই, সেই আমাকে ত্যাগ ক'রে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম্ম একথা আমি কখনো মান্‌বো না।"

শ্রীকান্ত কাশী হইতে প্রয়াগ ঘুরিয়া তাহার গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গেল। তাহার অসুখের খবর পাইয়া রাজলক্ষ্মী মান-অপমানের বোঝা দূরে সরাইয়া দিয়া তাহার প্রেমাস্পদের সেবা করিবার জন্য লোকালয়ে ছুটিয়া আসিল। সে একথা জানিত—তাহাকে লইয়া একটা অপ্রীতিকর কলরব উঠিতে পারে কিম্বা তাহার সম্বন্ধে পাঁচজন পাঁচ কথা কানাঘুষা করিতে পারে। কিন্তু সে-দিকে সে দৃকৃপাত পর্য্যন্ত করে নাই। শ্রীকান্তই তাহার ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব, লজ্জাহারী ও লজ্জারক্ষাকারী উভয়ই।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে লইয়া পাটনায় চলিয়া গেল, এবং সেখানে তাহাকে সুস্থ করিবার পর সঙ্গে করিয়া লইয়া তাহার জমিদারী গঙ্গা-মাটিতে গিয়া উপস্থিত হইল। এখানেও তাহার দিক্ হইতে শ্রীকান্তের সেবা-যত্নের ত্রুটি নাই। শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী যে কতখানি ভালবাসে তাহা তাহার দু' একটি কথার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। "ব্রাহ্মণ-ভোজন আমার মাথায় থাক্, তার জন্যে তোমাকে উপোষ করালে আমার স্বর্গের সিঁড়ি উপরের বদলে একেবারে পাতালে মুখ ক'রে দাঁড়াবে।" "তীর্থ-যাত্রা ক'রেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখ্‌তে পাইনি, তার বদলে কেবল তোমার লক্ষ্যহারা বিরস মুখই দিনরাত্রি চোখে পড়েছে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর ভালবাসার সঙ্গে তাহার হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান ছিল। শ্রীকান্তের

মনের গতি সে আপনার ইচ্ছামত করিয়া চালিত করিতে পারে নাই। এইখানেই তাহার আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হইয়াছে। শ্রীকান্তের নির্লিপ্ত ও দুর্ব্বশ প্রাণ রাজলক্ষ্মী আপনার মত করিয়া প্রণয়-পাশে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ নহে। এইখানে তাহার দুঃখ সব চেয়ে বেশী। এইখানেই তাহার প্রণয় লোকচক্ষে ব্যর্থ। রাজলক্ষ্মী বড় দুঃখেই বলিয়াছিল—"তোমাকে পাবার জন্যে আমি যা' করেছি তার অর্দ্ধেক করলেও বোধ হয় ভগবানকে এতদিনে পেতুম্। কিন্তু তোমাকে পেলুম্ না। রাজলক্ষ্মীও প্রতিদানের আশা করে। সে যখন দেখিল—শ্রীকান্তের নির্লিপ্ত মনকে আপনার বশে রাখিবার কোন উপায় নাই তখন তাহার মন শ্রীকান্তের উপর প্রীতিহীন বা শ্রদ্ধাহীন হয় নাই বটে, কিন্তু সংসারের প্রতি অনাসক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে থান-কাপড় পরিয়াছে, সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সেই মেঘের মত পিঠজোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশি কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং বার, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি লইয়া আপনাকে যতদূর সম্ভব নিযুক্ত রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছে। শ্রীকান্ত বর্ম্মা চলিয়া যাইবে জানিয়াও সে পূর্ব্বের মত কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করিল না। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় সে যেন এখন হইতে তাহার জীবনের সব কিছু নীরবে সহ্য করিয়া যাইবার জন্য মনকে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করিতেছে। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সহিত সংসারীভাবে বাস করিতে পারিলে থাকিতে পারিত। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে-পথে যাইতে পারে না। সে মাতৃত্ববোধের গৌরবকে পদদলিত করিতে চায় না। সে শ্রীকান্তের জন্যই বাইজির জীবন ত্যাগ করিয়া যে-রাজলক্ষ্মীর জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিল সে-রাজলক্ষ্মী বিধবা। সমাজের চক্ষে সে-রাজলক্ষ্মীর নিকট অন্য পুরুষের স্থান নাই।

রাজলক্ষ্মী পূজা-অর্চ্চনা, জপ-তপ প্রভৃতি লইয়া বাহিরে যেমন নিষ্ঠার জীবন যাপন করুক না কেন শ্রীকান্তই তাহার হৃদয়-দেবতা। সে জানে

শ্রীকান্ত তাহাকে যে-চক্ষেই দেখুক না কেন সে তাহাকেই ভালবাসে এবং এই ভালবাসা সে আমরণ এমন কি পরজন্ম পর্য্যন্তও টানিয়া লইয়া যাইতে একান্ত উন্মুখ। কলিকাতায় আসিয়া শ্রীকান্ত পুঁটুর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মীর অভিমত চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিল। আর কেহ আসিয়া শ্রীকান্তের উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহা ত রাজলক্ষ্মীর বরাবরের সহনাতীত ব্যাপার। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিল, "···কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি, পেয়েছিলুম অনেক তপস্যায়, অনেক সাধনায়। তাই, বিদায় দেবার কর্ত্তা তুমি নও, তোমার বিয়ের পরে তাদের সুমুখে বার হবো আমি কোন্ মুখে? এ অসম্মান সইবো কি ক'রে? যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখ্‌বে কে—পুঁটু? আর আমি ফিরে আস্‌বো তোমার বাড়ীর বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তারপরেও বেঁচে থাক্‌তে বলো নাকি?···আমার কামনা মরণের পরে যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। ভেবেছিলাম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে, তাকে নির্ম্মল আমাকে কর্‌তেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে তো থাক্‌ল আমার জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চনা, থাক্‌লো সুনন্দা, থাক্‌লো আমার গুরুদেব। তুমি দিলে বিষ আমি নেবো, কিন্তু ও (অপমান) নিতে পারবো না।...যে সূর্য্য অস্ত যাবে তার পুনরুদয়ের অপেক্ষায় বসে থাকার আমার আর সময় হবে না।"—৩য় পরিচ্ছেদ, ৪র্থ পর্ব্ব।

ইহার পরে রতনের মুখ হইতে শ্রীকান্তের সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনিয়া সে স্বচক্ষে শ্রীকান্তের অবস্থা দেখিবার জন্য কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর প্রেম একনিষ্ঠ। রাজলক্ষ্মী যে অবস্থায় পড়িয়া বাইজির জীবন অবলম্বন করিয়াছিল সে অবস্থায় তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন, উদ্যতদণ্ড সমাজ তাহার জন্য পুণ্যের ঝুলি দেখাইয়া দিয়া

তাহার উপর শত প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করে, শেষে তাহার হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া দিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে অঙ্গুলি দিয়া পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এ ব্যবস্থা নারীর জন্য, পুরুষের জন্য নয়। সমাজ আপনার কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিল বলিয়া গৌরব অনুভব করে। সে গৌরবে সমাজ উজ্জ্বল হয় কিনা জানি না, তবে পঙ্গু হয় একথা জানি। রাজলক্ষ্মী বাইজির জীবন যাপন করিয়াছিল, আবার হৃদয়ের কোণে শ্রীকান্তের জন্য একনিষ্ঠ প্রেমের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। ইহা বৈধই হউক, আর অবৈধই হউক, ইহা অসম্ভব নহে। আবশ্যক-বোধে নারী বার-বনিতার জীবন যাপন করিবার সনন্দ পায়, আবার সময় হইলে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবার অধিকার পায়, এমন রীতি জাপানের সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায়। রাজলক্ষ্মীর জীবনের চিত্র হয়ত আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভিনব, কিন্তু নারী বারবনিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং কেহ কেহ বারবনিতার জীবন কিছুদিন কাটাইয়াও আপনাদিগকে একনিষ্ঠভাবে সমাজ-জীবনের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে একান্ত উন্মুখ—এমন দৃষ্টান্ত এতদ্দেশে খুব বেশী না থাকিলেও পাওয়া যায়।

'শ্রীকান্তে'র মধ্যে যেখানে রাজলক্ষ্মীর মত চরিত্র চিত্রিত দেখা যায় সেইখানে আবার আর এক অদ্ভুত চরিত্র দেখা যায়—সে অভয়া। তাহার স্বামী বর্ম্মা-মুলুকে চাকরী করিত। সেই যে চাকরী করিতে গিয়াছে আর ফিরে নাই এবং অভয়া কয়েকখানি পত্র লিখিয়াও তাহার নিকট হইতে কোন জবাব পায় নাই। সেইজন্য অভয়া তাহার গ্রামের ভাই-সম্পর্কীয় রোহিণীকে সঙ্গে লইয়া স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বর্ম্মাদেশে আসিয়াছে। যে রমণী স্বামীর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ভিন্ন দেশে আসিয়াছে, স্বামী যে তাহার কতখানি আপনার—ইহাই ত

বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু স্বামীর প্রতি অভয়ার আসক্তি একটা অর্থহীন সংস্কারের মত, তাহার অধিক নহে। অভয়ার স্বামী-প্রেম একনিষ্ঠ বলা যায় না। যে-দিন সে বর্ম্মায় স্বামীর নিকটে লাঞ্ছিতা, প্রহৃতা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল সে-দিন তাহার সংস্কারের স্বামী-প্রেম খসিয়া পড়িয়াছিল। সে শ্রীকান্তকে বলিয়াছিল—"যার স্বামী এত বড় অপরাধ করেছে, সেই স্ত্রীর পক্ষে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে সারা জীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই তার নারী-জন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আর আমার মা হবার অধিকার নেই; সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান মেয়ে মানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? সব জাতে, সব ধর্ম্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে, আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক্ বন্ধ হয়ে গেছে, শ্রীকান্ত-বাবু?"…"স্বামীর কাছে পেয়েছি আমি অপমান,—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেছি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাক্‌তে বলেন?"…"তাঁর কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে ফুলে ভ'রে উঠে সার্থক হোতো? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানই কি আমার নারীজন্মের সব চেয়ে বড় সাধনা?" যে স্বামীর কাছে সে এমন ভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাহার সহিত সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে এবং

আর একজনের সহিত নূতন ঘরকন্না সুরু করিতে চায়। রোহিণী তাহাকে ভালবাসিত। অভয়া এখন রোহিণীকে লইয়াই জীবন কাটাইতে উন্মুখ। সে শ্রীকান্তকে বলিতেছে, "তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নাই। এমন লোকের সমস্ত জীবন পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিন্‌তে চাইনে।"..."একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে তাকেই জোর করে সারা জীবন সত্য ব'লে খাড়া রাখ্‌বার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব?" এতদিন অভয়া সমাজের মধ্যে ছিল, তাহার নারীত্ববোধ সমাজের বিধি-নিষেধ ও সংস্কারকে ঠেলিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই। বর্ম্মায় সমাজের বাহিরে স্বামীরই নিকট লাঞ্ছিত হইয়া ও লালসা মিটাইবার উপাদান হাতের কাছে পাইয়া তাহার নারীত্ববোধ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের কোন উল্লেখ নাই। নারীর আত্ম-সম্মানকে অপমানিত, বিমর্দ্দিত হইতে দেখিয়া অভয়ার মধ্যে যে তেজস্বিতা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা খুব কম নারীর মধ্যে দেখা যায় এবং ইহা প্রশংসার্হ। কিন্তু আপনার শুদ্ধমাত্র দেহ-মনের তৃপ্তির জন্য একনিষ্ঠতাকে বলি দেওয়া সমর্থনযোগ্য নহে। শরৎচন্দ্রের অভয়া-চরিত্র কিরণময়ীর উপর আর এক ধাপ। 'শেষ প্রশ্নে'র কমল-চরিত্র অঙ্কন শরৎচন্দ্রের এই জাতীয় চিত্রাঙ্কনের আপাততঃ শেষ চেষ্টা। তিনি ব্যক্তি-বিশেষের সুখের জন্য এই জাতীয় চরিত্র আঁকিয়াছেন, সমষ্টির মঙ্গলের জন্য নহে। ইহাতে সমাজের সংস্কার হয় না, ধ্বংসই হয়।

'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে বিরাজ-বৌএর মধ্যে স্বামী-প্রেমের একনিষ্ঠতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব কিছুই নাই। সংস্কারজাত ধর্ম্মবুদ্ধিই তাহার স্বামী-প্রেমের ভিত্তি। নয়

বৎসর বয়সে নীলাম্বরের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পল্লীগ্রামের যে আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া অধিকাংশ হিন্দুনারী স্বামীকেই দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিয়া লয় বিরাজ-বৌও সেই আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিরাজ নীলাম্বরকেই তাহার ধ্যান-জ্ঞান তাহার দেবতা বলিয়া জানে। বাল্যকাল হইতেই অচ্ছেদ্যভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, অল্প বয়সে স্ত্রী স্বামীকে আপনার বলিয়া মানিয়া লইলে তাহা সে বড় হইয়া কদাপি অস্বীকার করিবার কল্পনা করিতে পারিবে না—এই সব কারণেই বোধ হয় বাল্য বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল। বিরাজ স্বামীকে সুখী করিতে পারিলেই আপনি সুখী হয়। স্বামী এতটুকু কম আহার করিলে তাহার কষ্ট হয়, স্বামীর শরীর এতটুকু খারাপ হইলে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে। বিরাজ একদিন স্বামীর কাছে বলিয়াছে, "মেয়ে মানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই, বাপ, মা গেলে দুঃখ-কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্ব্বস্ব যায়।" মড়া পোড়ান, কীর্ত্তন গাওয়া, খোল বাজান আর গাঁজা খাওয়া—এই সব ব্যাপার নীলাম্বরের কাজের তালিকাভুক্ত ছিল। সংসার কিসে চলিবে, সে-দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। অথচ এই স্বামীই বিরাজের দেবতা। বিরাজ স্বামীর দোষগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু নীলাম্বর সে-দিকে কর্ণপাতও করে নাই। বিরাজ তাহা নীরবে সহ্য করিয়াই চলিয়াছে। সামান্য কোন কারণে স্বামী অসন্তুষ্ট হইলে, বিরাজ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, আর কিসে তিনি পুনরায় খুসী হইবেন এই লইয়া সে কত কথাই ভাবিয়াছে। সে কদাপি স্বামীর বিষণ্ণ বদন দেখিতে চায় না। বিরাজ অভিমানিনী। বিরাজ দুঃখ-কষ্ট সব সহিয়াছিল, এমন কি, আহার-সংস্থানের কোন উপায় না থাকিলে সে স্বামীর অজ্ঞাতসারে রাত্রি জাগরণ করিয়া ছাঁচ

প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা কষ্টে-স্থষ্টে সংসার চালাইয়াছিল। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাহার সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। হিন্দু নারী হইয়া স্বামীর জন্য দুঃখকষ্ট বরণ করাই তাহাদের ধর্ম্মাচরণ। কিন্তু স্বামী তাহার চরিত্রে অবিশ্বাস করেন—ইহা বোধ হয় কোন হিন্দু নারী সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য যে-দিন নীলাম্বর বিরাজের চরিত্রের উপর সংশয়াপন্ন হইয়াছিল সে-দিন বিরাজের সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে অভিমানে অন্ধ হইয়া স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া, যাহার কথা শুনিয়া সে বরাবর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে সেই জমিদার-পুত্রের বজরায় গিয়া উঠিয়াছিল। সে জমিদার-পুত্রকে দেখিয়া আপনার ভ্রান্তির বেদনা সহ্য করিতে পারিল না, আত্মহত্যার জন্য নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। যে-দিন সে স্বামীর সহিত পুনরায় মিলিত হইল সে-দিন সে অনুতাপানলে জ্বলিতেছিল। যে-দিন তাহার স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল সে-দিন সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, আর মরণের ভয় নাই। সে বলিতে লাগিল, "আমার সব দুঃখ এত দিনে সার্থক হ'ল—আর কিছু নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ—এইবার যাই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিগে।" হিন্দু নারী স্বামীর আগে মরিতে পারিলে আপনাকে পুণ্যবতী মনে করে। বিরাজের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সে স্বামীর কোলেই মাথা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। বিরাজ-বৌ পতিপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহার অভিনবত্ব কিছুই নাই। এতদ্দেশে হিন্দু ঘরে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'বিরাজ-বৌ' শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত একটি বাস্তব চিত্র।

'শেষ প্রশ্ন' পুস্তকে কমল-চরিত্রের মধ্যে চঞ্চল ও ক্ষণিক ভালবাসার যে স্বরূপ পাওয়া যায় তাহাকে প্রেম না বলিয়া মনের সুখ বলাই বোধ হয় সঙ্গত। কমলের ভালবাসায় এত বেশী কূট বুদ্ধি, তর্ক, যুক্তি ও

অসঙ্গতি পাওয়া যায় যে, তাহা সমাজের পক্ষে বিদ্রোহাত্মক বলিয়াই অবাঞ্ছনীয়। কমলের উদ্দাম মনোবৃত্তি যখন যেখানে সুখ পায়, তখন সেইখানেই নিবদ্ধ হয়। তাহার বিশ্লেষণ আমাদের আবহাওয়ায় অস্বাস্থ্যকর। কমলের এই জাতীয় মনোবৃত্তির দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম তাহার জন্ম, দ্বিতীয় তাহার শিক্ষা ও সংসর্গ। যে দুই বিভিন্ন শোণিত-ধারার মিলনে কমলের উৎপত্তি তাহা আমাদের চিরাচরিত প্রেমের মিলন নহে। তাহার মা ভ্রষ্টা বাঙ্গালী বিধবা, বাপ আসামের চা-বাগানের এক সাহেব। কমল উভয়েরই মনোবৃত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। সেইজন্য সে চঞ্চল, উদ্দাম ভোগ ও মনের সুখের দিকে একান্ত উন্মুখ। আর বাল্যকাল হইতে সে তাহার পিতার নিকটে থাকিয়া যে-শিক্ষা পাইয়াছে তাহাতে যে তাহার মনের গতি সুন্দরভাবে স্বাধীন ও স্বাভাবিক হইয়াছে তাহা নহে, তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়াছে এবং ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টার মধ্য দিয়া তাহার অসংজ্ঞাত, রুদ্ধ ও ইন্দ্রিয়-প্রধান লালসাগুলি মূর্ত্তি লইয়াছে। সমাজের, এমন কি, ললিত-কলার যত কিছু ফাঁক-ফুটা (flaw) আছে সবই তাহার দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এড়াইয়া যায় না।

প্রথমে এক অসমীয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সহিত কমলের বিবাহ হয়। বিবাহের কিছুদিন পরে সেই স্বামী মারা যায়। পরে শিবনাথের সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই মিলনে বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের বালাই কিছু ছিল না। উভয়ের মনের ক্ষণিক মিলই এই মিলনের ভিত্তি ছিল। কোন দিন উভয়ের মনের অমিল হেতু যদি সম্বন্ধটা অটুট না থাকে তবে তাহাতে কমলের আপত্তি নাই, অভিযোগ নাই। একমাত্র অনুষ্ঠানটাকেই তাহাদের মিলনের যোগ-সূত্র বলিয়া সে ধরিয়া

রাখিতে চায় না। ভাবটা এই—একদিন মনের মিলে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, আর একদিন মনের গরমিলে সেই বন্ধুত্ব ফাঁসিয়া গেল। অথচ সে বিষয়ে কমলের অভিমান নাই, অভিযোগও নাই। একমাত্র বিশ্লেষণ শক্তি দ্বারা সে সব কাটাইয়া দিতেছে। তাহার মতে দাম্পত্য-জীবন একটা আপোষ মাত্র। এই প্রকার মত একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। মনের সুখই তাহার চরম ও পরম লক্ষ্য। এই সুখলাভের জন্য সে জগতের অন্য কোন দিকে দৃক্‌পাত করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। যাহাদের হৃদয়ে প্রেমের পুঁজি কম, মস্তিষ্কে বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণ-শক্তি অধিক তাহাদের দৃক্‌পাত না করিলে চলে। কমল মনের তৃপ্তি লাভ করিতে গিয়া যেখানে যে বাধা পাইয়াছে তাহাকেই দুই পায়ে বিমর্দ্দিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা জীবনের তামসিক (art for art's sake), এমন কি, রাজসিক (balance of yearnings) অবস্থার পক্ষেও হয়ত সুন্দর কথা। কিন্তু ইহা যে আনন্দের নিত্য বস্তু অর্থাৎ প্রেমের পথ নয় তাহাতে আমরা নিঃসংশয়। কমল সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, অনুশাসন মানিয়া চলে না। কারণ, তাহার মতে এসব অর্থহীন। সে বলিতেছে, "উনি (শিবনাথ) যাবেন (বিবাহ) হয়নি ব'লে অস্বীকার করতে, আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড়ে ধরে ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখ্‌ব বেঁধে?"—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। সেইজন্যই শিবনাথের সহিত মিলনে যে-দিন ভাঙ্গন ধরিল সে-দিন কমলের কোন অভিযোগ নাই। এ যে ভালবাসার হাটে চুক্তি, ভালবাসার পাইকারী ব্যবসায়। তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাসি; তুমি আমাকে

ভালবাস না, আমি তোমাকে ভালবাসি না। কমলের মতে প্রেমের একনিষ্ঠতার মূল্য নাই। "একদিন যাকে ভালবেসেছি কোন দিন কোন কারণেই তার পরিবর্ত্তন হবার যো নেই—মনের এই অচল অসাড় জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।" আমরাও বলি, ইহা সত্যই তামসিক জীবনে সুন্দর নয়, কারণ তাহাতে অসংজ্ঞাত আত্মা রুদ্ধ ইচ্ছার জোয়ারে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার হিসাব নাই। রাজসিক জীবনেও সেটা স্বাস্থ্যকর নহে, মানিলাম। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সাত্ত্বিক অবস্থা অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ ও বিবেকের বাঁধন-কষণগুলি শ্লথ করিয়া ফেলি তাহা হইলে তাহাতে যে অধঃপতনের পথই সোজা করিয়া বাঁধান হইবে সে কথাও ভুলিলে চলিবে না।

তাজমহল দেখিতে গিয়া কমল অজিতের স্বল্প পরিচয় পাইয়াছিল, যে, সে আশু-বাবুর আত্মীয়। এই স্বল্প পরিচয়ের সূত্র লইয়াই কমল তাহার বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা হইতে অজিতকে ডাকিয়া থামাইল এবং তাহারই গাড়ীতে রাত্রিকালে তাহার সহিত অসঙ্কোচে বেড়াইতে চলিয়া গেল। অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত পুরুষের সহিত নারীর এমন ভাবে মিশিবার রীতি পাশ্চাত্য দেশেই সমধিক প্রচলিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোষাবহই হয়। কারণ যৌবন-লালসা-সংসর্গের ফল রোধ করিবে কে? এইজন্যই নারী-পুরুষের এই প্রকার অবাধ মিলা-মিশার রীতি আপত্তিজনক। অজিতের সহিত কথাবার্ত্তায় কমলের চটুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কমল জানিত শিবনাথ পাথর কিনিবার জন্য জয়পুর গিয়াছে। কিন্তু কথায় কথায় অজিতের মুখ হইতে প্রকাশ পাইল শিবনাথ জয়পুর যায় নাই, সে আগ্রায় আছে এবং গানবাজনা করিবার জন্য আশু-বাবুর বাড়ীতে যায়। বুদ্ধিমতী কমল আপনার বুদ্ধিমত্তার বলে বুঝিতে পারিল শিবনাথ তাহার নিকট হইতে সরিয়া

যাইতেছে। সেও আর তাহাকে আটকাইতে চাহিল না। তাহার চুক্তির ভালবাসা শেষ হইয়া গেল। তাহার ভালবাসা এমনই হাল্কা। এইবার অজিতকে লইয়া তাহার ভালবাসার পালা আরম্ভ হইল।

শিবনাথের সহিত তাহার বিচ্ছেদ যেমন আকস্মিক অজিতের প্রতি তাহার আসক্তিও তেমনই অপ্রত্যাশিত। অজিতের প্রতি তাহার ভালবাসার মধ্যে ক্রম-বিকাশ নাই, ক্রম-পরিণতি নাই। কমল মনে মনে জানে, একদিন যদি এই অজিতের সহিত তাহার মনের অমিল হয় তাহা হইলে সে অজিতের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আপত্তি করিবে না। দাম্পত্যজীবন তাহার নিকট লালসা মিটাইবার উপায় মাত্র। একদিন যে অজিত মনোরমার ছিল, শরৎচন্দ্র তাহারই সহিত কমলের প্রেমের দৌড় দেখাইয়াছেন। একদিন অজিত কমলের মতের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিল। কিসে যে সেও কমলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল—তাহারও কোন ইঙ্গিত নাই। যে শিবনাথ একদিন কমলের ছিল তাহারই সহিত মনোরমার বিবাহে কমল সম্মতি দিল। যে শিবনাথকে মনোরমা ঘৃণার চক্ষেই দেখিত তাহার প্রতি কি সূত্রে মনোরমার ভালবাসা জন্মিল তাহার বিশেষ কোন পরিচয় নাই। তবে এইটুকু জানা যায় যে, শিবনাথ ভাল গান গাহিতে পারিত এবং মনোরমাও সঙ্গীত-আসক্ত ছিল। কমল কেবলমাত্র আপনারই মনের তৃপ্তি চায়। মনের পবিবর্ত্তনের সহিত তাহার তৃপ্তি যে-রূপ লইবে তাহাই পরিপূরণ করিবার জন্য সে কোন বিধি-নিষেধ মানিতে চায় না। এক কথায় তাহার নিকটে বিধি-নিষেধের বন্ধন নাই। সে সংযম মানে না, ব্রহ্মচর্য্য মানে না। তাহার নিকটে বিধবার জীবনের নিগ্রহ অর্থহীন, একনিষ্ঠ প্রেম মূল্যহীন। শরৎচন্দ্র অতি চালাক, সেইজন্য যেখানে যেখানে কমলের কথা কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে সেই সেই স্থানে তিনি শ্রোতাকে নীরব রাখিয়াছেন

অথবা তর্কসূত্রকে অযথা দীর্ঘ ও জটিল করিয়াছেন। একটা কথা বলি— কমল চির-প্রচলিত বিধি মানিয়া চলার পক্ষপাতী নহে। দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে—কেবল ইহাই, কোন বিধি মানিয়া চলার পক্ষে সঙ্গত যুক্তি নহে। তবে দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে অথচ তাহা মঙ্গলজনক এমন বিধি যদি থাকে এবং তাহা যদি মানিয়া চলা হয় তবে তাহাতে দোষ কি? কোন বিধি মানিয়া চলার পক্ষে যদি সংশয় ঘটে তবে সেই বিধির পশ্চাতে কোন কল্যাণময় উদ্দেশ্য আছে কিনা দেখা দরকার। যে সব বিধি সংস্কারের মতই বহু যুগ ধরিয়া মানিয়া চলা হয় তাহার সমস্তই কখনও ভ্রান্তি বা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। শরৎচন্দ্র কমল-চরিত্র অঙ্কিত করিয়া যে আদর্শের পরিচয় দেখাইয়াছেন তাহা এদেশের উপযুক্ত নহে। কমল দো-আঁশলা, তাহার যুক্তিও সেই বিদেশ হইতে আমদানী করা, ইহাতে কাহারও কোনও সংশয় নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে যুক্তিগুলির কোন-কোনটি অকাট্য। কিন্তু তাহাও এখন প্রধানতঃ তিন কারণে আমাদের দেশে শ্রুতিকটু। প্রথম কথা এই যে, সত্যই আমরা বিশ্লেষণ-শক্তিকে কোন দিন বড় করিয়া দেখি নাই, কোন দিনই আমাদের দেশে উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকে লইয়া পাশ্চাত্য জগতের মত সমস্যা উপস্থিত হয় নাই, অথচ তাহাদের সমস্যা বিশ্লেষণ করিবার জন্য যে যুক্তি তাহাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছে তাহারই সূত্র টানিয়া কমলের মত দো-আঁশলার মুখ দিয়া তাহার লালসালোলুপ অথচ নিরুদ্ধ উদ্দাম যৌবনের ছিদ্রান্বেষণ ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত আকারে স্পর্দ্ধার সহিত প্রকাশ করিয়া ভাষার তুবড়ী ফুটানর দ্বারা মনস্তত্ত্ব-বিশারদ শরৎচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক মন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহা, দেশের যে জনসাধারণের এখনও সারল্য-প্রধান বিশ্বাস প্রবল, যাহারা এখনও আলোকপ্রাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে নাই তাহাদের রুচিবিগর্হিত হইয়া উঠিবে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই ধর্ম্ম না বুঝিলেও ধর্ম্ম-প্রধান। সরল বিশ্বাস সাধারণের পক্ষে সহজ-সুন্দর—এ বিষয়ে মনীষিগণ একমত। এখন, দেশের জনসাধারণ একমাত্র যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিত, সেইখানেই শরৎচন্দ্র গড়িবার জন্য নয়, শুধু ভাঙ্গিবার জন্য লেখনী-প্রতিভার সুদৃঢ় হাতুড়ী ধরিলেন। ভাঙ্গিতে সকলেই পারে, গড়িতে পারে কে? আজ পাশ্চাত্যের যে অবস্থা, তাহাতে কেহই বলিবেন না যে, তাহাদের পথই আমাদের চতুর্বর্গ লাভের পথ। তা'ছাড়া কে বলিতে পারে যে, আমাদের দেশের মত পাশ্চাত্য দেশেও Super Ego Complex ধর্ম্মাচরণ বা সাত্ত্বিক অবস্থার দ্বার খুলিয়া দিবে না? মানুষের পশুত্বই বাড়িয়া চলিবে, আর তাহার মাঝে যে বিবেক বাস করিতেছে তাহা কি চিরকাল সুপ্ত থাকিবে? কমলের যুক্তি আর এক কারণে শ্রুতি-কটু—কমল অপরের ত্রুটি বাহির করিতে এমনই সুপটু যে, তাহার যুক্তির তাড়নায় অধিকাংশের ভক্তজীবন যাপন করা এক প্রকার অসম্ভব।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে'র রমেশ যেমন একদিন নবীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দূরে উঁচুতে দাঁড়াইয়া নিরক্ষর গ্রামবাসীর উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহার আদর্শ প্রথমতঃ তাহাদিগের মধ্যে কার্য্যকর না হওয়ায় তাহাকে লাঠির ঘায়ে খানিকটা অবনত হইয়া তাহাদের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল, সেই রকম কমলের আদর্শ যদি কোন দিন লাঠির ঘায়ে সোজা হইয়া এদেশের মাটিতে আসিয়া পড়ে তবেই হয়ত কিছু কাজ হইতে পারে। কিরণময়ী, অচলা, অভয়ার মধ্যে রুদ্ধ প্রেমের যে স্বরূপ বিকাশ হইয়াছে তাহাই সমষ্টিভূত হইয়া কমলের মধ্যে কামাচরণে ও ছিদ্রান্বেষণে প্রকাশ পাইয়াছে। কমল কিরণময়ী হইতে পৃথক্, মন্দের ভাল। শরৎচন্দ্র কমলের জন্মের ইতি-বৃত্তের দিক দিয়া তাহার চরিত্রের এবম্প্রকার পরিণতির একটা কৈফিয়ৎ

দিবার পথ রাখিয়াছেন। এইবার বোধ হয় তিনি এই জাতীয় যে চরিত্র অঙ্কিত করিবেন তাহার মধ্যে শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবটাই প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। শরৎচন্দ্র কমলেরই মুখ দিয়া বলিয়াছেন—মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিধি-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আমরা বলি ইহা আংশিক সত্য। স্বাভাবিক গতিতে মনের যে পরিবর্ত্তন তাহাই অনুধাবনযোগ্য। ইচ্ছাকৃত-ভাবে মনের গতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যে উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টা তাহা সমর্থনীয় নহে, কারণ অধিকাংশ সময় তাহা অকল্যাণ বহিয়া আনে। শরৎচন্দ্র পুস্তকের নায়িকা কমলকে তর্কের বস্তা ঠিক নয়—ফোয়ারা করিয়া তুলিয়াছেন। কমল তর্ক তুলিয়াছে, সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। শরৎচন্দ্র কি সমস্যা সমাধানের দিক্‌টা না মাড়াইয়া সবিনয় ধৃষ্টতা ও বে-মালুম ফাঁকি-বাজির নিদর্শন দেখাইয়াছেন? সেইজন্যই বুঝি কায়দা করিয়া পুস্তকখানির অভিনব নামকরণ করিয়াছেন—শেষ প্রশ্ন অর্থাৎ একটা querry।

ব্যবহারিক জগতে আবশ্যকতা বা সীমারেখার মূল্য আছে। আমাদের বাহ্যিক অবস্থার যে সীমা তাহাতে আত্মা আপনাকে বিকশিত করিবার সুযোগ পায়। সীমা অতিক্রম করিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সত্যোপলব্ধির জন্য কমলের পক্ষে আমাদের দেশের নিয়ম-কানুন এড়াইয়া চলিলে বড় দোষের হয় না। আমরা প্রথমতঃ সত্য ও আনন্দ অনুভব করি, তারপর অনুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হই। কমল সত্যোপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই, সে যে-প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে তাহা উচ্চাঙ্গের প্রশ্ন নহে, তাহা শেষ প্রশ্নও নহে, তাহা অমীমাংশিত প্রশ্ন। সে সব প্রশ্ন আমাদের দেশের জন্য নহে। সেগুলি কমলের নিরুদ্ধ যৌন প্রবৃত্তির বিদ্রোহ। কমলের প্রশ্ন অতি তুচ্ছ বোধ করিয়া আমরা প্রত্যেকটির আলোচনা করিলাম না। সাধারণের দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করিবার

জন্য, নীতিহীন চরিত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র শিল্পীর তূলিকায় রঞ্জিত করিয়া সেই সব প্রশ্ন গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মানুষ ও সামাজিক মানুষই মানুষের সব নয়। মানবের মধ্যে প্রেমের সৌন্দর্য্য, আর তাহার শিক্ষা ও প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গতির সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্র জনসাধারণকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য ও সমাজের মধ্যে দ্রুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার জন্য কমল-চরিত্রের ভিতর দিয়া বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইবে—এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

কমল কোন কিছুতে বিশ্বাস করে না এবং সে যে বিশ্বাস করে না—এ দিক্ দিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করে, ইহাই তাহার অহমিকা। আমাদের দেশের জনসাধারণের ও সরলমনাঃ ব্যক্তিগণের অধিকাংশই সম্মোহক দ্যোতনার বশবর্ত্তী হইলে তাহাই সরল বিশ্বাসে মানিয়া লয় এবং কমল তথা শরৎচন্দ্রের মত নিপুণ ও শক্তিশালী যাদুকর তাহাদিগকে যাহা করিতে নির্দ্দেশ দিবেন, তাহারা দাসবৎ তাহারই অনুষ্ঠান করিতে পারে। ইহাকে সামাজিক বিদ্রোহ বলা চলে। ইহার পশ্চাতে জনকয়েক দৃঢ়সঙ্কল্প, শক্তিশালী, স্বার্থান্ধ ব্যক্তির কৌশলী কল্পনা রহিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষার মধ্য দিয়া ইহার প্রতিকার হওয়া তো দূরের কথা, বরং তথা-কথিত-শিক্ষিত-সম্প্রদায় আপনাদের নিম্নতর প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য নিয়ম ভাঙ্গিয়া চলিতে হীনভাবে উন্মুখ এবং তাহারা সহজেই কমলের তর্কের প্রচণ্ডতার মুখে ভাসিয়া যাইতে কুশলী। আমরা দেখিতে পাইব এবং শরৎচন্দ্রও দেখিতে পাইবেন—এই তর্কের অসঙ্গত প্রচণ্ডতা কি ভাবে ধ্বংসের পথে সাহায্য করে। মনে হয়, এই অপধর্ম্মসেবিতা প্রশ্রয় পাইলে ইহা সমাজকে বর্ব্বরতার যুগে টানিয়া লইয়া যাইবে।

সখীত্বে নারী

সাহিত্যে মাতৃত্ব, প্রেম প্রভৃতির ন্যায় সখীত্বেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে, এমন কি, ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যেও ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালে সখীর কাজ ছিল—নায়কের রূপ-গুণ বর্ণনা দ্বারা নায়িকার হৃদয়ে পূর্ব্বরাগ সঞ্চার করা, দূতীয়ালি করা অর্থাৎ নায়কের সংবাদ নায়িকার নিকট জ্ঞাপন করা এবং নায়িকার বার্ত্তা নায়কের নিকটে বহন করা, নায়িকাকে সজ্জিত করা এবং নায়কের সহিত মিলনে তাহাকে সাহায্য করা, নায়িকার সুখের সময় আনন্দোৎসব করা, আবার দুঃখের সময় সান্ত্বনা দেওয়া। এক কথায় সখীরাই ছিল নায়িকার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, দরদের দরদী, মরমের মরমী। প্রাচীনকাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের নাটকে উপন্যাসে সখীদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। "দুর্গেশনন্দিনী"তে বিমলা, 'কপালকুণ্ডলায়' লুৎফউন্নিসা, পেষমন, 'রাজসিংহে' নির্ম্মলকুমারী, 'যুগলাঙ্গুরী'য়ে অমলা, 'চন্দ্রশেখরে' কুল্‌সম্, 'মৃণালিনী'তে গিরিজায়ার চিত্র বঙ্কিম-সাহিত্যে সখীত্ব-চিত্রণের প্রমাণ। বঙ্কিম-পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যে সখীত্বের স্থান ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকখানি নাটকে সখীত্বের স্থান আছে। মনের গোপন কথা, বিশেষভাবে প্রেমের কথা আর একজন দরদীর নিকট জ্ঞাপন করিয়া আপনার হৃদয়ভার লাঘব করিবার জন্যই সখীর প্রয়োজনীয়তা সমধিক। নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভুল থাকিতে পারে, ছেদ পড়িতে পারে, বিচ্ছেদ বাড়িতে পারে, কিন্তু যথার্থ ভালবাসা

ভাঙ্গিবে কেন? ভালবাসা বা আকর্ষণ কোনটাই মিথ্যা নয়, মিথ্যা শুধু ভুল বুঝার মধ্যে। লৌহ-চুম্বকের আকর্ষণ যদি না ভাঙ্গে ভালবাসা ভাঙ্গিবে কেন? ভুলের বিচার প্রধানতঃ সখীত্বের দরবারে পেশ হয় এবং মীমাংসা হয়। সেইজন্য সখীত্বে নারী সমাজের কল্যাণকারিণী। আধুনিক সাহিত্যে প্রেমের চিত্র বর্ণন প্রাচীন সাহিত্য হইতে ভিন্নমুখী। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে শিল্পিগণ সখীর জন্য আর পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন না। শরৎ-সাহিত্যে সখীত্বের স্থান সংকীর্ণ। 'প্রেমে নারী'-শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা অনেকগুলি নারীর প্রেমের কাহিনী আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু প্রেম-কাহিনীর মধ্যে সখীত্ব-চিত্রণের নিদর্শন খুব কম। অনেক সময় সখী-নামধেয় পৃথক্ সত্ত্বা বর্ত্তমান না থাকিলেও বাড়ীর মধ্যে ননদে-ভাজে, জায়ে-জায়ে বা এই-রকম-সম্পর্ক-বিশিষ্ট দুই নারীর মধ্যে সখীত্ব দেখা যায়। শরৎ-সাহিত্যে সে রকম সখীত্বেরও বিশেষ পরিচয় নাই। শরৎ-সাহিত্যে যে দু' এক স্থানে সখীত্ব স্থান পাইয়াছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

'দেবদাসে' পার্ব্বতীর সখী মনোরমা। দেবদাসের প্রতি পার্ব্বতীর প্রণয় বিবাহের পূর্ব্বে কাহারও নিকটে প্রকাশ পায় নাই, একমাত্র সখী মনোরমার নিকটে প্রকাশ পাইয়াছে। মনোরমা পার্ব্বতীর বরের নাম জানে না বলিলে সে বলিল, 'জান না? আচ্ছা, ব'লে দিই—একটু হাসিয়া একটু গম্ভীর হইয়া পার্ব্বতী তাহার (মনোরমার) কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "জানিস্‌নে—শ্রীদেবদাস।" পার্ব্বতীর হৃদয়-দেবতা দেবদাসের সহিত মিলনের আশা না থাকায় তাহার হৃদয় বড়ই ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। আজ বলিবার মত একজনকে পাইয়া তাহার নিকটে আপনার দুঃখের সঞ্চয় মেলিয়া ধরিয়া যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইবার চেষ্টা করিল মাত্র। এ ত গেল পার্ব্বতীর পরিণয়ের পূর্ব্ব কথা। বিবাহের

পরেও যখন সে দেবদাসকে হৃদয়-মন্দির হইতে দূরে সরাইয়া দিতে পারে নাই, তখনও সে সখী মনোরমার নিকট তাহার গোপন কথা বলিতেছে, "মনো দিদি, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে কথা বুকের মধ্যে বাসা ক'রে আছে, এক আধ বার তা মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে। তুমি বোন্, তাই একথা শুন্‌লে।" "নিজের জিনিষ নিজে নিয়ে যাব, তাতে লজ্জা কি?" মনোরমা সখী হইয়া তাহার প্রেমের পরিণতিতে সহায়ক হইবার উপলক্ষ নহে। সে তাহার হৃদয়ের দুঃখের কাহিনী মন দিয়া শুনিবার ও তাহার সহিত রহস্যালাপ করিবার সখী মাত্র।

'বড় দিদি' গল্পে সুরেন্দ্রের প্রতি মাধবীর টান আর কাহারও নিকটে প্রকাশ পায় নাই, একমাত্র তাহার সখী মনোরমার নিকটে প্রকাশ পাইয়াছে। এখানেও সখীর নাম মনোরমা। মনকে রমণ করে বলিয়াই কি নামটা মনোরমা? যাহা হউক, যে-দিন মাধবী মনোরমাকে পত্রে লিখিল সে-দিন সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর আসক্তির একজন সাক্ষ্য রহিল। "প্রমীলার জন্য বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন—তাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়। আমার বোধ হয়—ইহার পূর্ব্বে সে কখন বাটীর বাহির হয় নাই—সংসারে কিছুই জানে না। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে তাহার এক দণ্ডও চলে না—আমার অর্দ্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে, তোমাকে পত্র লিখিব আর কখন্? এখন যদি তোমার শীঘ্র আসা হয়, তাহা হইলে এই অকর্ম্মণ্য লোকটাকে দেখাইয়া দিব।...শুনিতে পাই, তাহার পিতামাতা আছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহাদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ! আমি ত বোধ হয় এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না।" মনোরমার সহিত দেখা হইলে সুরেন্দ্রের প্রসঙ্গে মাধবী কাঁদিয়া ফেলিল, এখানেও মনোরমা সখী 'দেবদাসে'র মনোরমা সখীর মত দুঃখের কাহিনী শুনিবার

সঙ্গী মাত্র। 'পরিণীতা'য় ললিতার সখী চারুবালা আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত ললিতার সত্য সুখ-দুঃখের কোন আলাপ হয় নাই। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে সরযূর হরিবালা নামে এক সই জুটিয়াছে। হরিবালার সহিত সরযূর যত দিন মিশিবার সুযোগ হইয়াছে তাহার মধ্যে দুঃখের কথা কিছু হয় নাই। তাহার সহিত তাস খেলিয়া হাসি-তামাসা করিয়া তাহার সময় কাটিয়াছে।

'নববিধান' গল্পে বিভা ননদ, উষা বৌদিদি। উভয়ের মধ্যে যে ভাব তাহাকে সখীত্ব বলা যায় না। বিভার প্রতি উষার বরাবরই প্রীতির ভাব ছিল। উষার প্রথম আগমনের সময় হইতে বিভা তাহার প্রতি সেই যে বিরূপ হইয়াছিল তাহার সে ভাব একেবারে গল্পের শেষে দূর হইল। সে-দিন বিভা উষার নিকট মনে মনে নতি স্বীকার করিল। 'দর্পচূর্ণ' গল্পে বিমলা হিতাকাঙ্ক্ষিণী সখীর মতই ইন্দুর ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া আসিয়াছে এবং যাহাতে দাদা ও বৌদিদির দাম্পত্য-জীবন বিঘ্নিত কণ্টকিত না হয় সেজন্য সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে। বিমলা ও ইন্দুর মধ্যে ননদ-ভাজের সম্বন্ধ। এ ক্ষেত্রে বিমলাই দরদী সখীর মত ইন্দুর কল্যাণের দিকে সতত দৃষ্টি দিয়াছে। ইন্দুই বরং তাহার দর্পের বশে বিমলাকে মাড়াইয়া চলিয়াছে।

সেবায় নারী

নারী ছলনাময়ী। এক দিকে তাহার ছলনা, তাহার বহুরূপীত্ব, অন্য দিকে তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার মহনীয়তা একমাত্র সেবার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়। নারী সেবার দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতে যেরূপ সমর্থ হয় পুরুষ কখনও সেরূপ হয় না। একই সংসারের মধ্যে থাকিয়া নারী সেবার নিপুণতায় স্বামীর নিকট পতিব্রতা, সন্তানের নিকট স্নেহ-পরায়ণা, দাসদাসীর নিকট সদয়হৃদয়া, আর অপর সকলের নিকট উদারস্বভাবা। নারী সেবার গুণেই সহজে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। নারীর ছলনা সেবার মধ্য দিয়া যেমন প্রকাশ পায়, আবার তেম্‌নি অপ্রকাশও থাকে। এইখানেই তাহার সৌন্দর্য্য, এইখানেই তাহার জয়।

শরৎ-সাহিত্যে সেবা-নিপুণা নারীর যে কয়টি চিত্র আমাদের চোখে পড়ে তাহা বড়ই মনোজ্ঞ। 'দত্তা'য় দেখা যায়, বিজয়া নরেন্দ্রের সহিত পরিচয়ের প্রথম দিনে তাহার সেবার দ্বারা নরেন্দ্রনাথের মত একজন আত্মভোলা পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। নরেন্দ্র বলিয়াছিল, "আমি ত আপনার একেবারেই পর, আমার দুঃখকষ্টে সত্যই আপনার কিছু আসে যায় না। তবু আপনার আচরণ দেখে বাইরের কারুর বল্‌বার যো নেই যে, আমি আপনার লোক নই, পাছে কম খাই বা খাওয়ার সামান্য ত্রুটি হয়, এই ভয়ে নিজে না খেয়ে সুমুখে বসে রইলেন।... আপনার যত্ন করা দেখে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। অথচ এ কিছু আর যথার্থই সত্যি হতে পারে না, সে আমিও জানি, আপনিও জানেন

বরঞ্চ একে সত্যি বল্‌লেই আপনাকে ব্যঙ্গ করা হবে—অথচ মিথ্যে ব'লে ভাব্‌তেও যেন ইচ্ছে করে না।”—১১শ পরিচ্ছেদ। বিজয়ার সেবার মনোহারিত্বের এই এক সুন্দর চিত্র। যে-দিন নরেন্দ্র বিজয়ার নিকট মাইক্রস্কোপ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল সে-দিন সে বিজয়ার ছলনাপূর্ণ বিরুদ্ধতায় বিরক্ত হইয়াই চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিজয়ার প্রাণের সেবার মোহই আর একদিন নরেন্দ্রকে টানিয়া বিজয়ার নিকট হাজির করিয়াছিল।

'দেবদাসে' পার্ব্বতী আপনার গুপ্ত বাসনাকে গুপ্ততর করিবার জন্য যেমন সেবার আশ্রয় লইয়াছে, তেম্‌নি সেবার দ্বারাই সে সকলের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে স্বামীর সেবা করে, স্বামী বুঝিলেন—পার্ব্বতী সাধ্বী; সে পুত্রকন্যাদিগকে স্নেহ-যত্ন করে, তাহারা জানে—মা তাহাদের অতি স্নেহশীলা; সে সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করে, অন্ধ-খঞ্জের পরিচর্য্যা করে, তাহাদের নিকট পার্ব্বতী উদার-হৃদয়া। পার্ব্বতী একমাত্র সেবা-নৈপুণ্যেই সকলের আপন জন হইয়া রহিয়াছে। এইখানেই তাহার ছলনা বহুরূপীত্বের মধ্যে অপ্রকাশ। এইখানেই নারীর সৌন্দর্য্য ও মহনীয়তা। শরৎ-সাহিত্যে নারীর সেবার এই জাতীয় চিত্র অপরূপ বলা যায়।

'বড়দিদি'তে মাধবী আপনার সেবার নিপুণতায় পিত্রালয়ে সকলের নিকট সমধিক প্রিয় হইয়া রহিয়াছে। সংসারে তাহার পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সরকার-গোমস্তা, দাস-দাসী পর্য্যন্ত সকলকেই সে আপনার সেবার মাধুর্য্যে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সকলেই তাহার আচরণে মুগ্ধ ও আনন্দিত। ব্রজনাথ-বাবুর সংসার হইতে মাধবীর সেবার মঙ্গলময় হস্ত এক দিনের জন্য সরিয়া গেলে সংসারের অবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। এত লোক থাকিয়াও যেন সংসারের কাজ সুচারুভাবে চালাইতে পারে

না। মাধবীর এত যে সেবা, ইহার একমাত্র উৎস তাহার বঞ্চিত হৃদয়। এই বঞ্চিত হৃদয় যে-দিন সিঞ্চিত হইয়াছিল সে-দিন তাহার সেবা-নৈপুণ্য আরও বাড়িয়াছিল। প্রেম বা বড় সত্যের ইহাও একটি পরিচয় যে ইহা সর্ব্ব মানবকে আশ্রয় দান করে।

সেবার দ্বারা চিত্ত মুগ্ধ করার আর এক চমৎকার চিত্র 'পল্লী-সমাজের' মধ্যে পাওয়া যায়। যে-দিন তারকেশ্বরে রমা রমেশকে তাহার বাসায় ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইয়াছিল সে-দিন রমেশের মনে হইয়াছিল—"তাহার এই তেইশবর্ষব্যাপী জীবনটা একটা বেলার মধ্যে যেন আগা-গোড়া বদলাইয়া গেল। খাওয়ার মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিক আর কিছু যে কোন অবস্থাতেই থাকিতে পারে, ইহা সে জানিতই না। তাই, আজিকার এই অচিন্তনীয় পরিতৃপ্তির মধ্যে তাহার সমস্ত মন বিস্ময়ে মাধুর্য্যে একেবারে ডুবিয়া গেল।"—১০ম পরিচ্ছেদ। "রমা তাহার আহার্য্যের জন্য এখানে বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে নাই, নিতান্তই সাধারণ ভোজ্য-পেয় দিয়া খাওয়াইয়াছে।...এই আহার্য্যের স্বল্পতার ত্রুটি যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে সম্মুখে আসিয়া বসিল।" সেবার উপাদানের প্রাচুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্বই সেবার প্রকৃষ্টতার পূর্ণ পরিচয় নয়। যত্ন ও আন্তরিকতাই সেবার প্রাণবস্তু। রমেশ কথায় কথায় বলিল, "আমি তোমার ত কেউ নয় রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা, তবু প্রতিবেশী বলে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে পায়, আমার ত মনে হয়, পরের দুঃখ-কষ্ট দেখ্‌লে তারা পাগল হয়ে ছোটে।...এমন ক'রে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোন দিন খাওয়ায়নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জান্‌লাম রমা।"—১০ম পরিচ্ছেদ। এই রকম কথা

একদিন নরেন্দ্রও বিজয়ার নিকটে বলিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

নারীর সেবা কি ভাবে কিছুক্ষণের জন্যও দ্বন্দ্ব-দুঃখ ভুলাইয়া দেয়, আপনার জনকে ফিরাইয়া আনে, আত্মসমাহিত, দুর্ভেদ্য চিত্ততলে গিয়াও আঘাত করে তাহার এক চিত্র 'গৃহদাহে' মহিমের অসুখের সময় অচলার সেবার চিত্র। অচলা মহিমের সহিত কলহ করিয়া তাহার পল্লীগ্রামের বাড়ী হইতে সুরেশের সহিত তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু যে-দিন সে মহিমের অসুখের সময় রাত্রি জাগরণ করিয়া স্বামীর সেবা করিয়াছিল সে-দিন যেন উভয়ের চিত্তবিক্ষোভ শান্ত হইবার পথটা বেশ সহজ হইয়া গিয়াছিল। মহিম অচলার আন্তরিক সেবায় মুগ্ধ হইয়াছিল। যে মহিম কখনও কাহাকেও আপনার অভাব-অভিযোগের কথা বলে না, দুঃখ-কষ্টের কথা কোনও প্রকারে ব্যক্ত করে না, এমন কি, অচলা তাহার বিবাহিতা পত্নী হইলেও সে তাহার স্বাধীন বিবেচনায় হস্তক্ষেপ করিতে চায় না, যে অনেকটা ঘৃণা-প্রীতির অতীত, সেই মহিমই অচলার সেবায় মুগ্ধ হইয়া লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অচলা মহিমের একাকী বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার কথা উত্থাপন করিলে সে বলিয়াছিল, "এ অবস্থায় (অর্থাৎ একাকী অসুস্থ অবস্থায়) আমার নিজের বা পরের উপর নিভর করে স্বর্গে যেতেও ভরসা হয় না, তুমি কাছে না থাক্‌লে হয়ত আমি বেশী দিন বাঁচ্‌ব না।" এই মহিমই একদিন তাহার গৃহদাহের মত বিপদের দিনে অচলার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিল। নারী আপনার সেবাগুণে এম্‌নি করিয়াই অপরের চিত্ত বশ করে। সেবাগুণ বড় গুণ। সেবায় অনাত্মীয় আত্মীয়, পর আপন ও দূর নিকট হয়, এই জন্যই ত সেবা মহৎ গুণ। এই জন্যই ত সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মনীষিগণ সেবাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ইহার এত গুণকীর্ত্তন

করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বর্গীয়া কামিনী রায়ের এই পংক্তিগুলি মনে পড়ে—

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

শুধু নারী নহে, প্রত্যেক মানুষই যখন আপনার সেবার গণ্ডী সংকীর্ণ না রাখিয়া আপনার জন হইতে পরিবারের সকলের প্রতি, এইরূপে পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে দেশ ও দেশ হইতে সমস্ত বিশ্বের দিকে ছড়াইয়া দিতে থাকে তখনই মানুষ হয় মানব এবং সেই সময়ই সেইখানেই তাহার বিরাটত্ব। দুঃখ এই যে, আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যে সেবার সীমা যেন সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

কবি শরৎচন্দ্র

নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের যে পক্ষপাত তাহা নারীর সৌন্দর্য্যের জন্যই, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বিচার করিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, তিনি চেষ্টা করিয়া কোন নায়িকারই বহিঃসৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন নাই, তাঁহার কোন নায়িকাই রূপযৌবনে অলৌকিক সুন্দরী নহে, অথচ শিল্পীর তূলিকায় প্রত্যেকেই অন্তঃসৌন্দর্য্যে বিশিষ্ট ধরণে সহজ ও সুন্দর। সেই সৌন্দর্য্য আমাদিগকে কতখানি সুখ দান করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারই কৈফিয়তের জের টানিতে গিয়া আমরা বাংলার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে কবি বলিয়া ফেলিলাম। আমরা আরও দেখি যে, কবি শরৎচন্দ্র যত সুন্দর ও প্রাণবান্, আপন জন ও কল্যাণদায়ক, মনোজ্ঞানবিৎ শরৎচন্দ্র ততই বৈজ্ঞানিক ও উদাসীন, অথবা খেয়ালী ও ব্যবসায়াত্মক। পদ্য না লিখিলে কবি হওয়া যায় না—এ যুক্তি যাঁহারা পোষণ করেন আমরা তাঁহাদের সহিত ভিন্নমত। যে কোন ব্যক্তি পদ্য লিখিলেই যদি কবি হইত তবে দেশে এমন অনেক লোক আছেন যাহারা বহু পদ্য লিখিয়াছেন, অথচ কবি আখ্যার অনুপযুক্ত, ইহার কারণ কি? যে সব গুণ বর্ত্তমান থাকিলে পদ্য-লেখককে কবি বলা হয় সেই সমস্ত গুণ পদ্যের মধ্যে থাকে না বলিয়াই সেই সমস্ত পদ্যের লেখককে কবি বলা হয় না। তবে পদ্য-রচয়িতা বলা যাইতে পারে। যে সমস্ত পদ্য-লেখকের পদ্যের মধ্যে সেই সেই গুণ বর্ত্তমান তাঁহাদিগকেই সাধারণতঃ কবি বলা হয়।

কবিতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে সকল দেশের মনীষীই প্রায়

সমমত। কবিতার মধ্যে প্রধানতঃ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বাস্তব ও মহতী কল্পনা থাকে। প্রতীচীর এই বাস্তব সত্য বাহিরে প্রকৃতিতে নিহিত থাকে, আবার কাহারও কাহারও মতে রসকলা ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণতা হইতে অঙ্কুরিত। প্রাচীতে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির বাস্তবতা শুধু মূর্ত্তিসৌন্দর্য্যে কখনই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বিকাশ-সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য বিকাশের সব নয়। বাস্তবসৌন্দর্য্য ভাবসৌন্দর্য্যেই গূঢ়ভাবে নিহিত। কবিতার সংজ্ঞা সন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কবিতার ব্যাখা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন, যে চিন্তা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া রসবোধ সূচিত করে তাহার নাম কবিতা।[১] শেলী বলেন—কল্পনার বিকাশের নামই কবিতা।[২] পোপ বলেন—'ছন্দোবদ্ধ সুন্দর রচনার নামই কবিতা।[৩] উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি হুইট্‌ম্যান প্রথম ছন্দ ও মিল বাদ দিয়া গদ্য-কবিতা লিখেন। উদ্দেশ্য—যাহাতে ছন্দোবন্ধে মনের সুকুমার ভাবগুলি কোন রকমে আড়ষ্ট হইয়া না যায় এইজন্য সেগুলিকে সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করা। আকাশ ও বাতাস এই দুইটী কথায় বেশ মিল হয়, কিন্তু আকাশ ও আলোকে মিশিয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় তাহাই যে কবিতা। কবিতার মধ্যে আর যাহাই থাকুক্ না কেন, চিন্তার গভীরতা, কল্পনার পরিস্ফুটতা, রসবোধ, আবেগ, সহজভাব, অন্তর্দৃষ্টি এবং সুন্দর বিকাশশক্তির পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সব কবিতার মধ্যে এই সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকে না, সেগুলি কেবলমাত্র ছন্দোবদ্ধতার জন্য প্রকৃত কবিতা বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। কেহ কেহ ছন্দোবদ্ধতা

(১) **Poetry is the thought and words in which emotion spontaneously embodies itself.—Mill.**

(২) **Poetry is the expression of the imagination.—Shelly.**

(৩) **Poetry is the rhythmic creation of beauty.—Pope.**

কথাটার উপর জোর দেন।[১] যাহা হউক, নিয়ম-মাফিক ছন্দোবদ্ধ না থাকিলেও উল্লিখিত গুণগুলির বর্ত্তমানতা হেতু যে কোন কোন রচনাকে কবিতা না বলিলেও কাব্য বলা হয় তাহার প্রমাণ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় রচিত উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম। এই পুস্তকখানি ত কাব্য নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। কবিতা না লিখিলে কবি হওয়া যায় না—একথা আর সত্য নহে। সম্রাট্ সাজাহান কখনও কবিতা রচনা করেন নাই, কখনও কাব্য রচনা করেন নাই, কখনও কাব্য আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই, অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়াছেন,—

হে সম্রাট্-কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্য-বিলাসে,

(১) Poetry is the metrical Composition : the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of Mason.—Dr. Johnson. Poetry is nothing but musical thought.—Carlyle. Poetry is the concrete and artistic expression of the human mind in emotionl and rhythmical language.—Watts.

ভাষার অতীত তীরে
কাঙ্গাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্য-দূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্য হারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"
—শা-জাহান, বলাকা।

কাজেই দেখা যায়, কবিতা না লিখিলেও কবি হওয়া যায়। সুতরাং কবিতা লিখিলেই কবি হওয়া যায়, আর কবিতা না লিখিলে কবি হওয়া যায় না—এ কথা মানিয়া লইবার আর যাথার্থ্য থাকে না।

এক দল লোক আছেন যাঁহারা art is for art's sake—এই নীতি সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন—'প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্যই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। ইঁহারা অমার্জ্জিত রুচির জড়বাদী এবং মূলতঃ পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। আমরা সাহিত্য হইতে যে আনন্দ আহরণ করি তাহা বাস্তবিকই মানসিক অবস্থার বিকাশের উপর নির্ভর করে। অবস্থার পার্থক্য অনুসারে একই মানুষের আনন্দানুভূতিরও তারতম্য দেখা যায়। যাহাদের আবার আত্মবুদ্ধি বিকশিত তাহারা সাহিত্যের মধ্যে আত্মার বিকাশই অনুসন্ধান করে। যে সব পাঠক অলস ও ভ্রষ্ট-চরিত্র এবং যাহাদের স্বভাব চঞ্চল ও ভাবপ্রবণ তাহারা সাহিত্যের মধ্যে উত্তেজক গল্পের অনুসন্ধান করে।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে কবি বলিলাম, কারণ তাঁহার মধ্যে কবি হওয়ার উপযুক্ত গুণ বর্ত্তমান। শরৎচন্দ্র কবিতা লিখিলে কোন্ শ্রেণীর কবির মধ্যে স্থান লাভ করিতেন বা উপন্যাস রচনার ন্যায় তাঁহার কাব্য বা কবিতা রচনা কোন্ বিশিষ্ট পর্য্যায়ের অন্তর্গত হইত তাহা আমাদের

আলোচনার বিষয় নহে। তবে কবি হওয়ার গুণের পরিচয় বা কবিত্ব যে তাঁহার রচনার মধ্যে বর্ত্তমান আছে তাহাই আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। শরৎচন্দ্র চেষ্টা করিলে কবিতা লিখিতে পারিতেন কিনা তাহা আলোচনা না করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, চেষ্টা করিলে কবিতা লিখিতে পারা যায়, কিন্তু চেষ্টা করিলে কবি হওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের রচনাবলী সন্ধান করিলে তাঁহার মধ্যে কবি হওয়ার এই কয়টি গুণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ, অভিনব কল্পনা; দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাহেতু ভাবের গভীরতা; তৃতীয়তঃ, কথা-চাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি; চতুর্থতঃ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি; পঞ্চমতঃ, রসবোধ; ষষ্ঠতঃ, অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ; সপ্তমতঃ, সত্যানুভূতি ও আনন্দ-সৃষ্টি; অষ্টমতঃ, স্বাভাবিকতা।

প্রথমতঃ, দেখা যাউক, চিন্তা-ও-কল্পনা-রাজ্যে শরৎচন্দ্রের অভিনবত্ব কতদূর। শরৎচন্দ্রের রচনার অনেক স্থলে সূক্ষ্মদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবের ছায়া দৃষ্ট হইলেও অনুপূরক হিসাবে সবই যে তাঁহার কল্পনাপ্রসূত তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 'দত্তা', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি আখ্যায়িকা আমাদের কাছে বাস্তবতার পরিচয় দেয়। কিন্তু 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা কল্পনার লীলাই সমধিক দেখিতে পাই। এ কল্পনা প্রথম শ্রেণীর কল্পনা হইতে পারে। শরৎচন্দ্র অনেক স্থলে কল্পনাকে এমন নিখুঁতভাবে রূপ দিয়াছেন যে, তাহা বাস্তবের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' আখ্যায়িকার ইন্দ্র, অন্নদা দিদি, 'দেবদাসে' পার্ব্বতী প্রভৃতি চরিত্র শরৎচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি এবং এগুলি তাঁহার কল্পনার অপরূপ দান। শরৎচন্দ্রের কাল্পনিক জিনিষগুলি গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মর্ম্ম সংস্পর্শে সিক্ত হইয়া কেমন প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে তাহার নিদর্শন নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে উপলব্ধ হয়।

"রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসী-কৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্ব্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না, তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দু' চক্ষু ভরিয়া যে-রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘন শ্যাম! কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি যাই, তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান প্রান্তে বসিয়া নিজের নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া

বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয় ত, মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; এক দিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এম্‌নি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দু' চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব্বদুঃখভয়ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দু'টি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধ তমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যু-মন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি।—১ম পর্ব্ব, শ্রীকান্ত।

দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতা-প্রসূত ভাবের প্রগাঢ়তাই শরৎচন্দ্রের রচনাবলীকে অধিকতর নিখুঁত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কি নগর-জীবন, কি পল্লী-জীবন, কি মানবের বহির্জগৎ, কি তাহার অন্তর্জগৎ, কি সুখ, কি দুঃখ—সকল প্রকার বর্ণনাই শরৎচন্দ্রের হাতে অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যখন পল্লী-জীবন বর্ণনা করিতেছেন, তখন মনে হয় তিনি পল্লীতেই জীবন কাটাইয়াছেন, আবার যখন তিনি নগর-জীবন বর্ণনা করিতেছেন তখন মনে হয় পল্লী-জীবনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। শরৎচন্দ্র যখন সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণী ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন, তখন মনে হয় তিনি সমাজের তথাকথিত নীচশ্রেণী ও নিরক্ষরদিগের সহিত পরিচিত নন্। আবার যখন তিনি মাতাল, গাঁজাখোর, গুলিখোরদের কাণ্ড বর্ণনা করিতেছেন তখন ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় এমন নিখুঁত বর্ণনা কি করিয়া সম্ভব? অনেকেই নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, বহু বিচিত্র প্রকৃতির লোকের সহিত মিশিয়াছেন, নানা প্রকার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য

করিয়াছেন, কিন্তু এমন নিখুঁত বর্ণনা করা তাঁহাদের কয় জনের পক্ষে সম্ভব হয়? শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি আছে। সেইজন্য প্রায় কোন জিনিষই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকান্তের বর্ম্মা গমনের বর্ণনা আছে, তাহাতে কলিকাতার কয়লাঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ম্মায় উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার এক নিখুঁত চিত্র আছে। জাহাজে কুলীমজুরদিগের গতিবিধি হইতে আরম্ভ করিয়া ভদ্র, অভদ্র যাত্রীদিগের কথোপকথন, হাবভাব ও অন্যান্য নানাবিধ সামান্য বিষয় পর্য্যন্ত লেখকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। এই বর্ণনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও বিকাশ-শক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সমস্ত স্থান বা জিনিষের উপর দৃষ্টি পড়িলে মানুষ সাধারণতঃ ঘৃণায় দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়, শরৎচন্দ্র সেই সমস্ত স্থান ও জিনিষের এমন বর্ণনা দিয়াছেন, যে, তাহাতে মনে হয় এ সমস্ত অতি তুচ্ছ জিনিষও লেখকের দৃষ্টি ফাঁকি দিতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের ভাবের গভীরতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিজাত নহে, তাহা অনেক সময় আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতি হইতে প্রসূত। তাঁহার মনের সহস্র চক্ষু থাকিলেও হৃদয়ের একনিষ্ঠ দৃষ্টি আছে এবং আমরা Longfellowর কথায় বলি, হৃদয়ই পরম সত্যের সন্ধান করে।[১] শুধু এই হৃদয়াবেগ ও অন্তরের অনুভূতির দিক্ দিয়াই ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র অথবা কবি শরৎচন্দ্র কাহারও কাছেই নিষ্প্রভ নন্, এমন কি, রবীন্দ্রনাথের সম্মুখেও নন্।

---

(১) It is the heart, and not the brain
That to the highest doth attain.—Longfellow.

শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তের মুখ দিয়া কুশারী মহাশয়ের বাটীর বর্ণনা দিতেছেন। তাহা তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও প্রকাশভঙ্গীর সাবলীল গতির এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। "বাটীতে অনেকগুলি ঘর এবং সেগুলি মাটীর; তথাপি মনে হইল, কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা স্বচ্ছল ত বটেই, বোধ হয় একটু বিশেষ রকমই ভাল। প্রবেশ করিবার সময় বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলাম। ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম তেম্‌নি আরও গোটা দুই রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই হইবে। তাহারই উত্তরে একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্ব্বেই যেন তাহার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুল্লী নিকান-মুছান ঝরঝর করিতেছে এবং সেই পরিষ্কৃত স্থানটুকুর উপরে ছায়াতলে দু'টি পরিপুষ্ট গো-বৎস ঘাড় কাৎ করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে, তাহাদের মায়েরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে পড়িল না সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল কুশারী পরিবারে অন্নের মত দুগ্ধেরও বিশেষ কোন অনাটন নাই। দক্ষিণের বারান্দায় দেয়াল ঘেঁসিয়া ছয় সাতটা বড় বড় মাটীর কলসী বিঁড়ার উপর বসানো আছে। হয়ত গুড় আছে, কি, কি আছে জানি না, কিন্তু যত্ন দেখিয়া মনে হইল না যে তাহারা শূন্যগর্ভ কিম্বা অবহেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়ে দেখিলাম ঢেরা সমেত পাট এবং শণের গোছা বাঁধা রহিয়াছে—সুতরাং বাটীতে যে বিস্তর দড়ি-দড়ার আবশ্যক, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না।"

আর "শুক্‌না পাতায় আমের মধু ঝরিয়া চট্‌চটে আটার মত হইয়াছে, সেগুলা জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বে-দখল করিয়া বিরাজিত ঘেঁটু গাছের কুঞ্জ, মুকুলিত, বিকশিত পুষ্পসম্ভারে

একান্ত নিবিড়”—(শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব্ব) ; “সম্মুখের আম্রশাখায় পুষ্পিত লবঙ্গ মঞ্জরীর কয়েকটা সুদীর্ঘ স্তবক নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া আছে,”—(শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব্ব) এই ধরণের দৃষ্টিশক্তির বিভাব শরৎ-সাহিত্যের বহু স্থানেই পাওয়া যায়।

যে-রূপ রুচিসঙ্গত নয় সে-রূপ শরৎচন্দ্র এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা স্বরূপের মত পাঠকের স্মৃতি হইতে সহজে মুছিয়া যায় না। কিন্তু এই রূপের তলে যে অপরূপ হৃদয়-মাধুর্য্য আছে তাহার অঙ্কনেই শরৎচন্দ্রের কবিত্বটা যেন আরও বেশী পরিস্ফুট মনে হয়।

“উপস্থিত ইনি (ভামিনী) যেমনই কালো, তেমনই রোগা এবং লম্বা। ম্যালেরিয়া জ্বরে রঙটা যেন পোড়া কাঠের মত। কথাগুলা একটু বাঁকা-বাঁকা। সে হাসিয়া উপরের ও নীচের সমস্ত মাড়িটা অনাবৃত করিয়া ননদের হাত ধরিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় লইয়া গিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইল।”—অরক্ষণীয়া। যে ভামিনীর রূপের বহর এতখানি সেই ভামিনী একদিন জ্ঞানদার অসুখের সময় তাহার সম্বলের মধ্যে সম্বল একগাছি রূপার গোট বাঁধা দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছিল। শরৎচন্দ্র বহিঃসৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তঃসৌন্দর্য্যকেই বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। ইহাই প্রাচীর সৌন্দর্য্যশিল্প, ইহা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে।

‘শ্রীকান্তে’র প্রথম পর্ব্বে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের যে ভূত দর্শনের অবতারণা করিয়াছেন, অন্নদার সাপুড়িয়া স্বামীর নিকট হইতে ইন্দ্রনাথের মন্ত্র শিখিবার যে সরল কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা হইতে শরৎচন্দ্রের সত্যানুসন্ধিৎসু মনের রসগ্রাহিতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যানুভূতিতেই শরৎচন্দ্রের পরিচয়। শিল্পীতে, সুন্দর আত্মার অবস্থিতিতে সৌন্দর্য্যধর্ম্ম নিহিত, বাহিরের কিছুতেই নহে। অন্নদা দিদি জাতিকুল-

ধর্মত্যাগিনী, কিন্তু কত সুন্দর; সাবিত্রী মেসের ঝি, চরিত্রহীনাদের সহিত হয়ত এক পর্য্যায়ে গণ্য, কিন্তু কত উর্দ্ধে; পিয়ারী বাইজি হইয়াও প্রেমের পূজারিণী; ভামিনী কুরূপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে নিহিত পরার্থপরায়ণতায় সেও কত মনোমুগ্ধকরী। বার্ক বলেন—"আত্মরক্ষা ও সমাজের নির্দ্দেশই মহান্। সুন্দরের কল্পনা ইহার বেড়াজাল ভাঙ্গিতে পারে না।" শরৎচন্দ্র দু'এক স্থানে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র দরদী, সেইজন্য তিনি দাসী, পতিতা, কুৎসিতা, ঘৃণ্যা সকলকেই দরদ দিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে তাহাদের দুঃখের কাহিনী অনিন্দ্যসুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন, দু'এক স্থানে অবশ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে।

শরৎচন্দ্রের সত্যদৃষ্টি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও কশাঘাত প্রকাশ-ভঙ্গীর সৌষ্ঠবে স্থানে স্থানে কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছে। অরক্ষণীয়া গল্পে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন—'পরদিন সায়াহ্ন কালে, শতকরা ৮০ জন ভদ্র-বাঙ্গালী যাহা করে, প্রিয়নাথও তাহাই করিলেন অর্থাৎ আফিসের ৩০৲ টাকার চাকরীর মায়া কাটাইয়া ২৬ বৎসরের বিধবা ও ১৩ বৎসরের অনূঢ়া কন্যার বোঝা তদপেক্ষা কোন এক দুর্ভাগ্য আত্মীয়ের মাথায় তুলিয়া দিয়া ৩৬ বৎসর বয়সে প্রায় বিনা চিকিৎসায় ৮০ বৎসরের সমতুল্য একটা জীর্ণ কঙ্কালসার দেহ তুলসীবেদীমূলে পরিত্যাগ করিয়া 'গঙ্গানারায়ণ' ব্রহ্ম নাম শুনিতে শুনিতে বোধ করি বা হিন্দুর বিষ্ণুলোকেই গেলেন।'—২য় পরিচ্ছেদ। শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে আমরা কবিত্বের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসু ও বিশ্লেষক মনের পরিচয়ই সমধিক। তবে তাঁহার বৈজ্ঞানিক মন কবিত্বের অন্তরায় নহে।

শেষ কথা

'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' ও 'শেষ প্রশ্নে' সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে অন্য যে কোন উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, রসসৃষ্টি ও বিশেষভাবে আনন্দরস-সৃষ্টিই তাহার চরম ও পরম উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্ত তিনখানি পুস্তকে আমরা সে দিক্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, কারণ লেখকের স্বাভাবিক লিখনভঙ্গী ইচ্ছাকৃতভাবেই স্থানে স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে লেখক ইচ্ছা করিয়াই সমস্যা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেই সেই স্থানে আনন্দরস-সৃষ্টির পক্ষে বাধা উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সেই স্থানে রচনা সাহিত্যের দিকে না গিয়া সমস্যার পর সমস্যা তুলিয়া নিছক তর্কজাল সৃষ্টি করিতে সগর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছে—কায়দাটা এই—পণ্ডিতী ধরণে উপদেশ দিয়া আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা নহে, কোন কিছু মানিব না, আপনার খোস-খেয়ালে বহিয়া যাইব, এইরূপ সাহঙ্কার দৃপ্ত দেখাইবার প্রয়াস। আর যে সমস্ত সাহিত্যের সমজদার শরৎ-সাহিত্যের আনন্দরস পুরাপুরি নিখুঁতভাবে ভোগ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শরৎচন্দ্রকে বাহবা দেন, তাঁহারা আপনাদিগকে বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, সেটা তাঁহাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নহে, সেটা সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলা বা উদ্দামতার সহিত আর একজনকে সহায়তা করিতে দেখিয়া খুসী হওয়ার চঞ্চল অস্বাস্থ্যকর-প্রবৃত্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহিত্যে চিত্ত-প্রসাদ চাই—একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্রষ্টার এই বিষয়ের মূল উপাদান কি কি যাহা হইতে তিনি

পাঠক-পাঠিকার কাছেও যেমন মূলতঃ আনন্দ বণ্টন করিতে পারিবেন, তেমনি তাঁহার সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের অন্তরালে সত্যের ইঙ্গিত রাখিতে গিয়া তিনি যে শুধু কালের খেয়াল চাটিয়া চলিবেন তাহা নহে, বরং এমন কিছু সৃষ্টির নিপুণতার পরিচয় দিবেন যাহাতে দেশ তাহার পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা দূর করিয়া ফেলিতে পারে। শাস্ত্রে চিত্ত-প্রসাদের চারি প্রকার উপাদানের কথা দেখা যায়—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। মৈত্রী কি? না, পরের সুখে সুখী হওয়া। আমরা শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে অধিক স্থলেই সুখী? রাজলক্ষ্মী পিয়ারী বাইজী হইয়াও বঙ্কুর মা। শরৎচন্দ্র নারীর মা না হইবার দৈব-দুর্ব্বিপাককে অতি সহজে করায়ত্ত করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার লেখনী-সৌষ্ঠবকে সুন্দর করিয়াছেন। হাঁ, পিয়ারী স্বাধীন এবং উন্মুক্ত জীবন যাপন করিয়াও যখন বঙ্কুর মা হইল তখন রাজলক্ষ্মী প্রেমাস্পদকে অতি সন্নিকটে পাইয়াও অশ্রুর অর্ঘ্য ছাড়া আর কোন আর্দ্র স্পর্শে তাহার প্রেমাভিষেক সম্পন্ন করে নাই বা করিবার ইচ্ছাও রাখে নাই। রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে আমরা সুখী। সুখী বলিবার কারণ শ্রীকান্তের কথায় বলিতে চাই—"বিরুদ্ধ অশ্রুগাঢ় ফিরিবার ডাক......... সেই যে রূপহীন, ভাষাহীন দুর্ব্বার আকর্ষণ আমাকে অহর্নিশি টানিতেই লাগিল, দেশ-বিদেশের ব্যবধান তাহার কাছে কতটুকু? যখন ফিরিয়া আসিলাম বাহিরের লোক আমার পরাজয়ের গ্লানিটাই দেখিতে পাইল, আমার মাথার অম্লানকান্ত জয়মাল্য তাহাদের চোখে পড়িল না।" আমরা ইহা দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি, করুণা ও ভয়ের পথ পরিষ্কার করাটাই ট্র্যাজেডির কাজ নয়, তাহাদের সন্তুষ্টিবিধান করা, অসংযত প্রবৃত্তি দমন করা ও অসমঞ্জস কামনাটা জয় করাও তাহার কাজ।

চিত্ত-প্রসাদের দ্বিতীয় বস্তু করুণা কি? না, পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া। রমা ও পার্ব্বতীর ট্র্যাজেডিতে আমাদের কাছে এই উপাদান সম্যক্‌ভাবেই চিত্ততোষ দান করে। তৃতীয় উপাদান মুদিতা কি? না, পরের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য অনুমোদন। আমরা বিষয়ীভূত লোক। অতিথিসৎকারের জন্য দাতাকর্ণের পুত্রহত্যা ব্যাপারে আমাদের অনু-মোদন আসা দূরের কথা, বরং একটা বীভৎস ঝাঁকানিতে আমাদের মন ভরিয়া তুলে। অথচ যে পার্ব্বতী অন্তরের অন্তরতম কোণ হইতে বঞ্চিত তাহারই অতৃপ্ত চিত্তের অনুষ্ঠিত দান, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি সৎকার্য্য অনুমোদন করিয়া আমরা আমাদের প্রাণের ন্যূনাধিক গভীরতায় অল্প বিস্তর তুষ্টিলাভ করিতে পারি।

প্রসাদের শেষ কথা উপেক্ষা, এবং তাহা কি? না, পরের অনুষ্ঠিত অসৎ কর্ম্ম উপেক্ষা করা। শরৎচন্দ্র সমাজের পঙ্কিল ছবিগুলি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট না করিলেই পারিতেন। আমরাও স্থানে স্থানে তাঁহার পঙ্কিল ছবিগুলি ইচ্ছা করিয়াই উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা পাই নাই।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য হইতে পারে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা জীবনের বাসনা, কার্য্য, চেষ্টা প্রভৃতির জটিলতা অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সত্যের মূল্য সৌন্দর্য্যে; শিল্পের মধ্যে মনস্তত্ত্বের নগ্ন চিত্র চলে না। বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী ঘৃণাকারজনক আবহাওয়ার মধ্যে যথা বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষার্থী যখন আমোদ-আহ্লাদের ক্ষেত্রে সেই ঘৃণাকারজনক পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করে তখন সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। সেখানে সে সুগন্ধি পুষ্পের জন্যই উৎসুক হয়। যেখানে অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় নিপীড়িত, লাঞ্ছিত রমা, রাজলক্ষ্মী, পার্ব্বতী, অন্নদা প্রভৃতির প্রতি

শরৎচন্দ্রকে সমবেদনা প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই সেখানে তিনি আমাদের নমস্য। কিন্তু তিনি যেখানে অবাঞ্ছনীয় চিত্রের উদ্ঘাটন করিয়া সামাজিক অকল্যাণ করিয়াছেন সেখানে আমরা তাঁহার সহিত ভিন্নমত এবং তাঁহার প্রচেষ্টার প্রশংসা করিতে বা অনুমোদন করিতে অপারগ।

শরৎচন্দ্র 'অরক্ষণীয়া,' 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি গল্পে বাংলার পল্লী-গ্রামের সামাজিক দুর্দ্দশা ও দুর্নীতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে পল্লীর প্রতি তাঁহার দরদ দৃষ্ট হয়। তিনি রচনার মধ্য দিয়া দুর্দ্দশার দিকে দরদ দেখাইয়াছেন এবং স্থানে স্থানে দুর্নীতির উপর কশাঘাতও করিয়াছেন। যাহারা সমাজের দুর্দ্দশা ও দুর্নীতির জন্য দায়ী শরৎচন্দ্র তাহাদিগকে কোথাও কোথাও টানিয়া বাহির করিয়াছেন এবং লোক-চক্ষে তাহাদের অবস্থাটা সোজাসুজি দেখাইয়া তাহাদিগকে বেশ একটু অপ্রতিভ করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া ঘোল ঢালিবার বন্দোবস্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন। এসব ত বেশ কথা। দুর্দ্দশায় দরদ দেখান, দুর্নীতি দমনে দ্রুত সাহায্য করা—এ সবই ত আমাদের কাম্য। 'বামুনের মেয়ে' গল্পে বিধবা জ্ঞানদার ভ্রূণ-হত্যার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহার ভ্রূণ-সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রধানতঃ দায়ী সমাজপতি গোলোক মুখোপাধ্যায়। আর পরোক্ষভাবে দায়ী সমাজের অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অন্যবিধ পরিবেশ। শরৎচন্দ্র যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণের বাড়ীর ঘটনা। ব্রাহ্মণ সমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলিয়াই কথিত। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কর্ম্মশ্রেষ্ঠতার এক চিত্র সর্ব্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া সমাজ-সংস্কারের দিকে শরৎচন্দ্র অনেকটা সাহায্য করিয়াছেন মাত্র। তিনি দোষীর শাসনের ব্যবস্থাটা করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। তিনি জ্ঞানদাকে সহানুভূতির ছায়ায় রাখিয়া

বৃন্দাবন লইয়া গেলেন। কেহ কেহ হয়ত বলিল, শেষে মেয়েটার ভাগ্যে এই ছিল! আহা! গোলোক তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া দিল! শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ কারণের শাসন ও পরোক্ষ কারণের মূলোৎপাটনের ব্যবস্থার দিক্‌টা না মাড়াইয়া যে দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন তাহা সহানুভূতির নাম দিয়া প্রশংসা করিবার মত নহে। বর্ত্তমান সময়ে তথাকথিত আলোক-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এই প্রকার ব্যাপার ঘটে না তাহা নহে—এ কথা শরৎচন্দ্রও ভালভাবেই জানেন মনে হয়, এবং সে সব ক্ষেত্রেও তাঁহার অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য 'এ কি হইল, এ যে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ উঠিল' বলিয়া চাঞ্চল্য উঠিবার ও চমক লাগিয়া যাইবার কথা।[১] যদি না লাগে তবে বলিতে হইবে তাহা স্বাভাবিক সুষ্ঠু নিয়মের ব্যভিচার। আশা করি, শরৎচন্দ্র সে-প্রকৃতির নন্। সেই জন্যই বলি, শরৎচন্দ্র, এই সব ক্ষেত্রে আলোকপ্রাপ্ত সমাজে যাহারা এই রকম কদর্য্য ব্যাপারের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী তাহাদিগকে একবার লোকচক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রয়াসী হউন। আজ শুধু শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না, যাহারা আলোকপ্রাপ্ত বলিয়া সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া যায় তাহাদের মধ্যে এ বিশ্রী কাণ্ড কেন ঘটে? আলোকপ্রাপ্ত সমাজ যদি এই ব্যাপারকে বিশ্রী কাণ্ড না বলেন তবে আমরা নাচার। শরৎচন্দ্র কি একথা অস্বীকার করিবেন—আধুনিক সাহিত্যের প্রভাব এজন্য অনেকাংশে দায়ী? শরৎচন্দ্র আজ মনে হয় ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন—দুর্য্যোধন অক্ষ-ক্রীড়ায় অন্যায়ভাবে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত

(১) .... But skin and film the ulcerous place
While rank corruption mining all within
Infects unseen.

—Hamlet, Act IV, Sec. III.

করিতেছে এবং বনবাসে প্রেরণ করিতেছে। কিন্তু মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে দমন করিতে পারিতেছিলেন না—এমন কি সম্পর্কচ্যুত হইয়াও থাকিতে পারিতেছিলেন না। সেইরূপ শরৎচন্দ্র নিজের যে মন্ত্রপ্রচারের ফল নিজ জীবনে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছেন, সেই মন্ত্র-প্রচারের সংস্পর্শ হইতে তিনি মিথ্যা পার্থিব ভোগের ক্ষণিক-সুখকর আশায় আপনাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

পূর্ব্বে সমাজে যে অনাচার অনুষ্ঠিত হইত তাহার অনেক বিষয়ে তথাকথিত সভ্য, শিক্ষিত, সমাজপতিগণই অগ্রণী ছিলেন। আর আজকাল তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ই অগ্রণী। নারীর অবাধ গতি, প্রকাশ্যে যৌন-বিজ্ঞান চর্চ্চা, ভোগ মিটাইয়াও জন্মশাসন—এই সব কে প্রবর্ত্তন করিল? তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজ। পূর্ব্বে অনাচারের মুখোস ছিল ধর্ম্ম ইত্যাদি। আজকাল অনাচারের মুখোস হইয়াছে শিক্ষালাভ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রচারের চেষ্টা। আমাদের মনে হয় এই সব ব্যভিচারের জন্য শিক্ষাও পরোক্ষভাবে দায়ী। শরৎচন্দ্র এই শিক্ষা সমর্থন করেন কিনা জানি না। যৌন-বিজ্ঞান-চর্চ্চার আবশ্যকতা আছে মানি। কিন্তু অসংযত ভাবে, অসম্বদ্ধ প্রণালীতে যৌন-বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবার উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টা কোন কালেই কোন ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নহে। সাহিত্য বিজ্ঞান নহে বা বিজ্ঞান-চর্চ্চার ক্ষেত্রও নহে।

সমাজের দোষ উদ্ঘাটন করিয়া দোষ ও স্থানে স্থানে দোষীকে কশাঘাত করিয়া শরৎচন্দ্র সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর রচনার প্রকাশ ও প্রচার করিয়া এবং তৎপক্ষে সাহায্য করিয়া আবার সেই সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছেন কেন? তাঁহার

'গৃহদাহের' অচলার কথায় বলি—"যাকে এক সময়ে বাঁচান যায়, আর এক সময় ইচ্ছে করলে বুঝি তাঁকে খুন করা যায়?"—১১শ পরিচ্ছেদ। যদি খুন করা যায় তবে বুঝিতে হইবে সেখানে আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির বাসনাটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং সেখানে আর যাহাই প্রকাশ হউক না কেন—মনুষ্যত্বের ও সুষ্ঠু সৌন্দর্য্যের বিভাব পাওয়া যায় না।

একবার কলিকাতা আশুতোষ কলেজের বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—"যাহার যে রকম শিক্ষা যাহার যে রকম শক্তি, যাহার যে রকম রুচি তিনি তাহারই অনুপাতে সাহিত্য গড়িয়া তুলেন। এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি থাকিবার তাহা থাকিবে এবং যাহা না থাকিবার তাহা লোপ পাইবে।" যাহা থাকিবার থাকিবে এবং যাহা লোপ পাইবার তাহা লোপ পাইবে—এ সব নিছক ফাঁকির কথা। এ ত একেবারে বর্ত্তমানকে অবহেলা করিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অবস্থাসঙ্কট অতিক্রম করিবার ফন্দি। সাহিত্যরথীদের কোনও act এ সাহিত্যও কি সমালোচনার বহির্ভূত থাকিবে? বিজাতীয় আধুনিক সাহিত্যের বহুল প্রচারে সমাজের উপর কি স্বাস্থ্যকর প্রভাব পড়িতে পারে? আমাদের দেশে যে খাবার পাওয়া যায় তাহা না খাইয়া অপরের দেশের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে যে স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে ইহার কোনও ইঙ্গিত প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। এ-দিকেও কি সাহিত্যের দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা নাই? সাহিত্য কি তবে আপনার খোস-খেয়ালে বহিয়া যাইবে? সমাজে থাকিয়া সমাজের হিতাহিতের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা যেন অনেকটা শিবকেই বাদ দিয়া শিবচতুর্দ্দশী পালনের জন্য সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়ার মত। সমাজকে বাদ দিয়া যে-সাহিত্য তাহা তমঃপ্রধান, art for

art's sake এর সাহিত্য। তাহার প্রধান উপকরণ কামাচরণ (sex-gratification)। তাহা বিলাসের সাহিত্য, খোস-খেয়ালের সাহিত্য, কল্যাণের নহে, তাহা আনন্দেরও নহে। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—"মানুষের ভাল অথবা মন্দ লাগার উপর কোন সাহিত্যই নির্ভর করে না। সে তাহার প্রয়োজনে আপনা হইতেই নামিয়া যায়।" এই উক্তির সময় বোধ হয় সমাজহীন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার কথাটা তাঁহার মনের সম্মুখে ভাসিতেছিল। যদি তাহাই হয় তাহা হইলেও বলি—সে-ও যে একটা ব্যবস্থা, তাহার পরিপোষকতার বিরুদ্ধে যখন সেই কালে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে থাকিবে তখন তাহাও ত সমালোচনার বহির্ভূত থাকিবে না ? বিশ্বজনের আনন্দের জন্য যে সাহিত্য তাহা কোন্ কালে কোন্ দেশে কোন্ সাহিত্যিকপ্রবরের লেখনী হইতে বাহির হইয়া আসিবে তাহাও জানা যায় না।

সাহিত্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহ কখনও রুদ্ধ হয় না এবং তাহার প্রচারের দ্বারা দেশের মন কলুষিত হয় না, একথা মানি। আর যদি সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে সমস্যা-সৃষ্টির দ্বারা জটিলতা বাড়াইবার ইচ্ছা সচেতন থাকে তবে সাহিত্য সৃষ্টির সাবলীল গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ফলে সাহিত্য আনন্দজনক না হইয়া তর্কাত্মক ও জটপাকান হইয়া উঠে। সত্য প্রচার দ্বারা যদি দেশের মঙ্গল সাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, (নিছক সত্য কথার সারাংশ বিজ্ঞানেই স্থান পায়) তবে শরৎ-প্রতিভার নিকট 'গৃহদাহে'র মত সাহিত্য-সৃষ্টির আশা আমরা রাখি না। কারণ এই জাতীয় পুস্তকে যদিও শরৎ-প্রতিভার এক দিকের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সংঘর্ষশীল মনের পরিস্ফুরণ শক্তি প্রতিভাত হয় তবুও 'অরক্ষণীয়া' 'পল্লী-সমাজ' প্রভৃতি গল্পে যে দরদ পাওয়া গিয়াছে সে দরদ আর পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের মনে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিটাও কম নাই মনে হয়।

সেই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে 'গৃহদাহ' জাতীয় পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়া কল্পনাপ্রবণ বাঙ্গালী জাতির নিপীড়িত যুবক মনের সাময়িক-উত্তেজনাপ্রদ কিছু কিছু খোরাকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানেও তাঁহার মনস্তত্ত্ব ধরিবার আর এক বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্র একথা ভালভাবেই বুঝেন—এই জাতীয় পুস্তক আর যাহাই করুক, জনপ্রিয় সাহিত্যস্রষ্টার লেখনী হইতে বাহির হইলে লেখকের পকেট পূর্ণ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। শরৎ-প্রতিভা যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করিবার সম্যক্ উপযুক্ত—একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রকে যেন কিসে পাইয়া বসে—তাঁহাকে বিষয়ান্তরে টানিয়া লইয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের যে কয়খানি পুস্তকের মধ্যে সংঘর্ষশীল মনের খেলা সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা' ও 'শেষ প্রশ্ন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র যে একদিন 'শেষ প্রশ্নে'র মত পুস্তক লিখিয়া নূতন আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা দেখাইবেন, 'দেবদাসে' তাহার আভাস পাওয়া যায়। 'দেবদাস' যখন প্রকাশিত হয় তখন শরৎচন্দ্রের সচেতন মনে বোধ হয় সমাজের অহিত করিবার বাহ্য ইচ্ছা ছিল না বা তখন নবীন লেখক বলিয়া একটা কিছু বাড়াবাড়ি করিবার সাহসের অভাব ছিল। 'দেবদাসে' পার্ব্বতী আপনার মনের গোপন কক্ষে যাহাকে লইয়া দিন গুণিতে থাকুক না কেন, সমাজ পার্ব্বতীর মনের কথা টের পায় নাই। তা' ছাড়া পার্ব্বতী সমাজের বিধি-নিষেধের বাধা মানিয়া আপনাকে এমন সংযতভাবে চালাইয়া লইয়া গিয়াছে যে, সেখানে বাহ্যতঃ কাহারও পক্ষ হইতে কোন দিক্ দিয়াই আপত্তি উঠে নাই। আপত্তি না উঠিবার আরও কথা এই যে, পার্ব্বতীর রুদ্ধ বাসনা সাত্ত্বিক গুণে রূপান্তরিত হইয়াছে। নবীন লেখক সাহস পাইলেন। 'চরিত্রহীন'

প্রকাশ হইল। 'চরিত্রহীন' বাস্তব চিত্র। এই পুস্তক লইয়া সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। মনে হয়, এই চাঞ্চল্য সাবিত্রী ও সতীশের প্রণয়-ব্যাপার লইয়া ততটা নহে, কিরণময়ীর যৌবনলালসা লইয়াও ততটা নহে, যতটা কামনাতৃপ্তির নগ্ন চিত্র উদ্ঘাটনের জন্য। এইখানে তাঁহার অসংযমের পরিচয়। 'দেবদাসে' পার্ব্বতীর প্রণয়ের খেলা পার্ব্বতীর মনেই ছিল, তাহা বাহিরের বড় কেহ জানিতে পারে নাই। বিধবা সাবিত্রী সতীশকে গভীরভাবে ভালবাসিলেও সে শেষ পর্য্যন্ত সতীশের সহিত বাহ্যতঃ মিলিত হইতে পারে নাই। এই সব স্থলে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্য দুইই লক্ষিত হয়। কিন্তু আকস্মিক্ হউক্, আর ইচ্ছাকৃতই হউক্ (আমাদের মনে হয় ইচ্ছাকৃত), তাঁহার লেখনীর যে অসংযমের পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে সমাজের মধ্যে একটা আপত্তির কলরব উত্থিত হইল। এ দিক্টাও বাঁচান দরকার। কাজেই শরৎচন্দ্র কিছুদিনের জন্য এই জাতীয় রচনা প্রকাশ বন্ধ রাখিলেন এবং কয়েকখানি হিন্দুর গার্হস্থ্য চিত্র, সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিলেন। আমাদের মনে হয়, কামনা-পরিতৃপ্তির নগ্ন চিত্র এমনই বিশ্রীভাবে সর্ব্বসমক্ষে লেখকের স্বাধীনতার বলে উদ্ঘাটিত না করিলে তিনি আত্মপক্ষ, সমাজপক্ষ ও সাহিত্যপক্ষ সব দিক্ দিয়াই ভাল করিতেন।

কিছুদিন অতীত হইবার পর শরৎচন্দ্র গৃহদাহ করিবার জন্য 'গৃহদাহ' প্রকাশ করিলেন। এখানেও অচলার সংঘর্ষশীল মনের পরিচয় দিতে গিয়া যে ব্যভিচারের চিত্র অঙ্কিত করিলেন তাহা লইয়া আবার সমাজে ভীষণ আপত্তি উঠিল। জানি না, সংজ্ঞাত মন ও অসংজ্ঞাত আত্মার সংঘর্ষের লীলা দেখান ব্যতীত শরৎচন্দ্রের মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা। যাহা হউক্, ইহার পর শরৎচন্দ্র আবার লেখনীর সংযম রক্ষা করিয়া

আপনার প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এবারও তিনি কয়েকখানি সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপনার সমাজের প্রতি দরদ প্রকাশ করিয়া ছাড়িলেন। শরৎচন্দ্র যুবক মনের উগ্র-উত্তেজনা-সূচক এক-একখানি রচনা প্রকাশ করিতেছেন, আবার সংরক্ষণশীল জনসাধারণের বাঁধন-কষণের দিকটা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাহাদের রুচি-মাফিক রচনা বাহির করিয়াছেন। আমরা ইহা ব্যবসায়াত্মক মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সুবিধা-গ্রহণের দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। এই জাতীয় রচনার মধ্যে শিল্পীর আপাততঃ সর্ব্বশেষ রচনা সমাধানবিহীন 'শেস প্রশ্ন'। 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহে' সম্পূর্ণ অসংযম ছিল। 'শেষ প্রশ্নে' বিদ্রোহী-মনের উগ্র উচ্ছৃঙ্খলতার সারাংশ প্রকাশ পাইল। 'শেষ প্রশ্ন' পুস্তকখানি যে কোন্ শ্রেণীর পাঠক সমর্থন করিবেন তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না, তবে যাহাদের চরিত্র কমলের চরিত্রের ন্যায় বিদ্রোহী, যাহাদের হৃদয় প্রেম-বঞ্চিত, লালসা-লোলুপ অথচ নিরুদ্ধপ্রেম কিম্বা যাহারা উচ্ছৃঙ্খল বে-পরোয়া হইয়াও কেবলমাত্র তর্কের পরোয়ানা-বলে সমাজেটিকিয়া থাকিতে চায় সেই বিশিষ্ট্য শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা ইহার সমর্থক, তাহাতে সংশয় নাই। 'শেষ প্রশ্ন' সত্যই যেন শরৎচন্দ্রের দিক্ দিয়াই শেষ প্রশ্ন হয়। তিনি যেন এই জাতীয় প্রশ্ন আর না ছাড়েন। তিনি ত আজ পর্য্যন্ত বহু সমস্যার আমদানী করিলেন। কোন সমস্যাই সমাধান করিতে পারিলেন না। ইহার পরও শরৎচন্দ্রের আর কোন সমস্যা টানিয়া বাহির করিবার ইচ্ছা আছে না কি? 'শেষ প্রশ্ন' সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, ইহা কতকগুলি অমীমাংসিত তর্ক-বিতর্ক ও মূল্যহীন বিদ্রোহানলের স্ফুলিঙ্গ-সমষ্টি মাত্র। শরৎচন্দ্র ঠকিবার পর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, কাজেই তাহার বনিয়াদ কিছু দৃঢ় ও পাকা। তিনি 'শেষ প্রশ্নে' মূল্যহীন বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছেন, অবশ্য নগ্ন চিত্র প্রকাশের অসংযমের পরিচয় দেন নাই। এবারে তিনি

সামাজিক বন্ধনের একেবারে মূলে আঘাত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক বলশেভিজম্ না হইলেও সামাজিক বলশেভিজম্—সামাজিক প্রথার মূলোৎপাটনই বটে। স্বাধীন মনের পরিচয় দেওয়ার অজুহাতে তিনি নারীর বহু বিবাহ (monogamy বুঝি তাঁর monotonous লাগে) ও সেই সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতিরও সমস্যা আমদানী করিয়াছেন। কিন্তু মীমাংসা করেন নাই, প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া নীরব রহিয়াছেন। তাঁহার বলিবার কথা বোধ হয় ইহাই যে,—হে যুবকগণ, এই বার তোমাদের যাহা খুসী করিবার সুপথ দেখাইয়া দিলাম, তোমরা আপন মনে খেলা কর। আমি বৃদ্ধ সাহিত্যেকের ন্যায় বসিয়া বসিয়া দেখি এবং নয়ন-মন সার্থক করি।

সমাজে যখন 'শেষ প্রশ্ন' লইয়া তুমুল প্রতিবাদ উঠিল, চতুর শরৎচন্দ্র তখন আপনার প্রতিষ্ঠার দিকে আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িলেন। হিন্দুর পারিবারিক চিত্র 'বিপ্রদাস' দেখা দিল। শরৎচন্দ্র তাল রাখিতে দক্ষ, সঙ্গীত শিখিলে না জানি তিনি কিরূপ সঙ্গীতপারদর্শী হইতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ সৃষ্টি করিতে গিয়া স্থানে স্থানে ঠিক্ নির্ম্মমভাবে নয়, চরিত্রের যে দৃঢ়তাসূচক অংশ ব্যক্তিত্ব—personality—the governing force of one's life to be—বহুলাংশে যাহা unconscious mind বা repressed urges, তাহাকেই খর্ব্ব করিয়া বা দুর্ব্বল করিয়া নায়িকাকে আত্মহত্যার কবলে ফেলিয়াছেন। শরৎচন্দ্র আদর্শ-সৃষ্টির জন্য কোথায়ও আত্মহত্যারূপ ভীরুতার প্রশ্রয় দেন নাই। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ কিন্তু তাঁহার সত্যদৃষ্টি নগ্নতার বীভৎসতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। নারীর প্রেমের যে দ্বন্দ্বময়তার একাংশ সতীত্ব, অপরাংশ ছিনালি—তাহারই টানা-পোড়েনের ফলাও বর্ণনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে তাঁহার সাহিত্যে সুমতি ও কুমতির আমদানী

করিয়া রসসৃষ্টি করিয়াছেন সেখানে শরৎচন্দ্র সংজ্ঞাত ও অসংজ্ঞাত মনের আশ্রয় লইয়া তাহাদের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারীর দ্বন্দ্বময়তার শুধু বিশ্রী খিচুড়ীই সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট পুরুষ-চরিত্রের যে কোন অংশে অসঙ্গত মেয়েলি ভঙ্গী ও স্ত্রী-চরিত্রের যে কোন অংশে অনাবশ্যক পুরুষালি ভাবের পরিচয় নাই। যদি শরৎচন্দ্র মনোযোগ দিয়া পুরুষ-চরিত্র গড়িয়া তুলিতেন, তবে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তৎপ্রভাবে প্রভাবান্বিত অতি-আধুনিক সাহিত্য অত্যধিক প্রচারের ফলে দেশের নব্য-শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে যে বে-মানান মেয়েলি ঢং ও নব্য-শিক্ষিতা যুবতীদিগের মধ্যে যে অবাঞ্ছনীয় সৌষ্ঠবহীন পুরুষালি ভাবের অকল্যাণের বন্যা আসিয়াছে সেই অকল্যাণ হইতে তিনি দেশকে আরও বাঁচাইতে পারিতেন।

শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক—একথা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। তবে জনপ্রিয়তাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি—একথা মনে করিলে ভুল করা হইবে। জনপ্রিয় হওয়ার অর্থ এই যে, জনসাধারণের অধিকাংশের খেয়াল পরিতৃপ্ত করার জন্য তাহাদের নিকট পরিচিত হওয়া। শরৎচন্দ্র বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব জনপ্রিয় হওয়ার অনেক পরে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক —একথা প্রমাণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি যদি শ্রেষ্ঠ নন্ তবে কি করিয়া লোকপ্রিয় হইলেন? এ সম্বন্ধে এখানে দু' একটি কথা বলিতেছি। শরৎচন্দ্র প্রথম প্রথম যে সমস্ত গল্প বা উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহাতে বাস্তবতাই ছিল সমধিক—সমধিক বলি কেন তাহা সর্ব্বাংশেই বাস্তবতার চিত্র। তাহাতে romance বা imagination যে একেবারে ছিল না তাহা বলিতেছি না, তবে তাহা পরিস্ফুট

নহে। এই বাস্তবতার চিত্র সম্মুখে পাইয়া সাধারণ পাঠক বিস্মিত বা চমকিত হয় নাই, বরং বাস্তব চিত্রগুলিকে শরৎচন্দ্রের নিপুণ তূলিকাপাতে মধুরভাবে অঙ্কিত দেখিয়া বেশ খুসীই হইয়াছিল। কিন্তু চিত্রগুলির মধ্যে অপরূপত্ব কিছু না থাকায় সাধারণ পাঠক শরৎচন্দ্রকে খুব একটা বাহবা দেয় নাই। সহরের পাঠক শরৎচন্দ্রের রচনায় সহরের চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া এবং পল্লীর পাঠক পল্লীর চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া বেশ আমোদ অনুভব করিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে যাহা ঘটিতে দেখিতে পান তাহাই শরৎ-সাহিত্যে হুবহু মধুরভাবে অঙ্কিত দেখিলেন, তাঁহারা শরৎ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রকে নিবিড় করিয়া পাইলেন, কিন্তু বাহবা দেওয়ার মত কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ লিখিয়া নোবেল পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন সেই গীতাঞ্জলি যখন এদেশেই প্রকাশিত হয় তখনও কেহ বিস্ময়াভিভূত হয় নাই। কারণ গীতাঞ্জলির মধ্যে ভারতের পক্ষে এমন কিছু নূতনত্ব, অপূর্ব্বত্ব ছিল না যাহাতে ভারতের পাঠক একেবারে বিস্মিত ও অবাক্ হইয়া যাইতে পারে, তবে পাঠক গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া উপভোগ করিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনাগুলি অনেক পাঠকের উপভোগ্য হইলেও একশ্রেণীর পাঠক ঠিক্ উপভোগ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন দেশের নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায় শরৎ-রচনা পাঠ করিয়া আমোদ অনুভব করিলেও ঠিক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দরকার ছিল—নূতনত্ব, অস্বাভাবিকত্ব, romance, সেইজন্য যখন 'বড়দিদি' প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের নূতন ধরণের রচনা বাহির হইল, তখন এই শ্রেণীর পাঠক পুলকিত হইলেন, আর শরৎচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত পাঠকদিগের নিকট হইতে বাহবা পাইলেন।

এইরূপে শরৎচন্দ্র অধিকাংশ পাঠকের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিলেন, তাঁহার নূতন ধরণের রচনা দেখিয়া, যাঁহাদের রচনায় নূতনত্ব, romance ছিল—এমন কোন কোন লেখক বোধ করি হিংসায় একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। লোকে প্রশংসা করিলেও নাম রটে, দুর্ণাম করিলেও নাম চাপা পড়ে না। যাহাই হউক্, শরৎচন্দ্র এক রকম কথ্য ও অকথ্য প্রশংসা ও দুর্ণাম—সব দিক্ দিয়াই বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

লেখকের সাময়িক জনপ্রিয়ত্ব দেখিয়া যাঁহারা লেখকের রচনার উৎকর্ষের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন, আমরা বলি, তাঁহাদের বিবেচনা বা বিচার ঠিক্ হয় না।* বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জীবন সময়ে বর্ত্তমান যুগের শরৎচন্দ্রের ন্যায় জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল গত হইলেও তিনি সমানভাবে বা ততোধিকভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছেন এবং অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছেন। যাঁহারা লেখকের কেবলমাত্র জনপ্রিয় হওয়া-না-হওয়ার উপর নির্ভর করিয়া লেখকের রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করেন তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তার নজির দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক বলিবেন তাঁহাদের মতেই বলি—শরৎচন্দ্রের এখনও সে সময় হয় নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ে বাংলার ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে শরৎচন্দ্র শ্রেষ্ঠ—ইহাতে সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত

* Transitory popularity is not a proof a genious. But permanent popularity is.—Stephen Leacock.